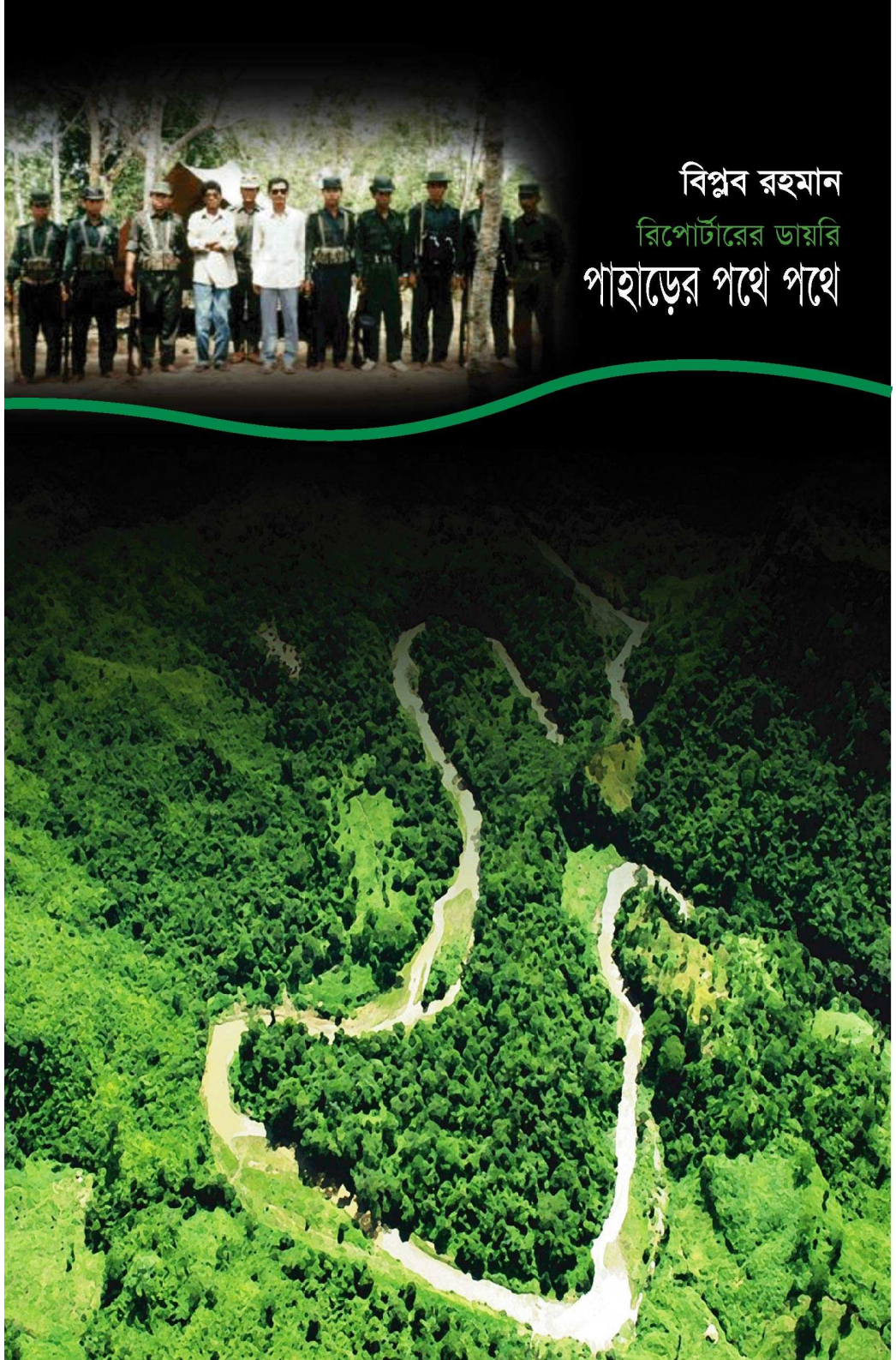

রিপোর্টারের ডায়েরি: পাহাড়ের পথে পথে

বিপ্লব রহমান

প্রচ্ছদ: আহমেদ অরূপ কামাল

প্রকাশক: পাঠসূত্র

প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ২০০৯

প্রাপ্তিস্থান: কনকর্ড টাওয়ার, কাঁটাবন, ঢাকা

দাম: ৮০ টাকা

গেরিলা নেতা সন্তু লারমার প্রথম সাক্ষাৎকার

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের বছর তিনেক আগে, অশান্ত পার্বত্য পরিস্থিতিতে ১৯৯৪ সালের ৪মে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে গেরিলা গ্রুপ শান্তিবাহিনীর প্রধান, জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমার একটি সরেজমিন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। বার্তা সংস্থা 'নিউজ অ্যান্ড ফিচার সার্ভিসের' তৎকালীন প্রতিনিধি এই প্রতিবেদকের ধারণকৃত এটিই হচ্ছে কোনো গণমাধ্যমকে দেওয়া গেরিলা নেতা সন্তু লারমার প্রথম সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় খাগড়াছড়ির পানছড়ির দুদুকছড়িতে শান্তি বাহিনীর একটি হাইড-আউটে। আর এটি ১৯৯৪ সালের ১০ মে দৈনিক আজকের কাগজে প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিলো– 'একান্ত সাক্ষাৎকারে শান্তিবাহিনী প্রধান সন্তু লারমা। শান্তিবাহিনী কোনো বিদেশি শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।'

সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপ:

প্রশ্ন: বিগত ও বর্তমান কয়েকটি সরকারের আমলে জেএসএস একাধিকবার অসফল ও সফল বৈঠকের আয়োজন করেছে। এ পর্যায়ে বৈঠকগুলো সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

উত্তর: আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলনের রূপ সশস্ত্র হলেও জেএসএস শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের পথ বাতিল করে দেয়নি। তাই এতোদিন ধরে জেএসএস শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বিগত এরশাদ সরকারের আমলে ছয়বার বৈঠক হয়েছে। কিন্তু সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমন কী জনসংহতি সমিতির উপস্থাপিত পাঁচ দফা দাবিও এরশাদ সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। এতে সে সরকারের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি জানা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

এরপর খালেদা জিয়ার সরকারের সাথেও সাতবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বর্তমান সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জেএসএস-এর পাঁচদফা দাবি পেশ করা হয়েছে। এ দাবিনামার লিখিতভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৯ সালে প্রণীত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের মাধ্যমে পাঁচ দফা দাবি, তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে।

সরকারের এই বক্তব্য এবং সরকারের সাথে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত বিগত বৈঠকসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে তারা সুস্পষ্টভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সৃষ্ট রাজনৈতিক সমাধানে আদৌ আন্তরিক কি না, এ সমস্যার সমাধানে সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে কি না এবং এ সরকারের সদিচ্ছা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকে কোনো মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এই এলাকার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের প্রেক্ষাপটে স্পষ্টতই বিগত এরশাদ সরকার ও খালেদা জিয়ার সরকারের মধ্যে এ পর্যন্ত কোনো মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়নি।

প্রশ্ন: জেএসএস-এর সংশোধিত পাঁচ দফা, তথা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি এ পর্যায়ে কিভাবে অর্জিত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? পাঁচ দফা দাবি পূরণ ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ও আশু পদক্ষেপই বা কী?

উত্তর: জেএসএস জুম্ম বা পাহাড়ি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছে। এ সংগঠনের পাঁচদফা তথা স্বায়ত্তশাসন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কোনো অপূরণীয় দাবি হতে পারে না। কিন্তু বলা যায়, বাংলাদেশ সরকার এ দাবি পূরণে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। যতক্ষণ না বাংলাদেশ সরকার এ দাবি পূরণ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি আন্দোলন চালিয়ে যাবেই।

সর্বোপরি বাংলাদেশ সরকার পাঁচদফা দাবি পূরণে অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানে যাতে এগিয়ে আসে, সেজন্য জেএসএস বাংলাদেশের সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ে অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

প্রশ্ন: সরকার এ পর্যায়ে জেএসএস-এর দাবিনামাসহ (শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সেনা বাহিনীর) যুদ্ধবিরতির অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে কতটুকু আন্তরিক বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: উল্লেখিত দাবিনামা পূরণ ও যুদ্ধবিরতির অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট বিষয়। যদিও উভয়পক্ষে গৃহীত যুদ্ধ বিরতির শর্তাবলি বাস্তবায়নে যথেষ্ট আন্তরিক এবং যথাযথভাবে পালন করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও তার সশস্ত্রবাহিনী যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী প্রতিপালনে আন্ত

রিক নয় বলেই বার বার প্রমাণিত হচ্ছে। ক্যাম্প সম্প্রসারণসহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক শান্তিবাহিনীর হাইড আউট আক্রমণ, তল্লাসি অভিযান, জেএসএস সদস্যদের ধর-পাকড়, জুম্ম জনগণের ওপর গণহত্যা, গ্রেফতার, নির্যাতন-নিপীড়ন, ধর্ষণ– ইত্যাদি সবই অব্যাহত আছে। এছাড়া পার্বত্য জেলায় বেআইনি অনুপ্রবেশ, বসতিস্থাপন, জমি বেদখল, সুকৌশলে বি-হরাগতদের জমি বন্দোবস্তকরণ, সামরিক প্রশাসনের প্রাধান্য বিস্তার ইত্যাদি বন্ধ হয়নি।

প্রশ্ন: অভিযোগ রয়েছে, জেএসএস গণবিচ্ছিন্ন ও সন্ত্রাসী শক্তি; তারা ভারত সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ক্রমেই ঘোলা করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য?

উত্তর: জেএসএস জুম্ম জনগণের মধ্যে থেকে জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বার্থে গড়ে উঠেছে। এটি জুম্ম জনগণেরই একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। আর জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে এ সংগঠন কাজ করে চলেছে। তাই জেএসএসকে কোনো গণবিচ্ছিন্ন সংগঠন বলা যেতে পারে না এবং একে কোনো অবস্থাতেই সন্ত্রাসী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। তাই জনসংহতি সমিতি একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছে।

সুতরাং কায়েমি স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান চায় না এবং যারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন নস্যাৎ করে দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর, সেইসব কায়েমী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি জেএসএসকে গণবিচ্ছিন্ন ও সন্ত্রাসী শক্তি বলে অপপ্রচার করে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জেএসএস নিজেই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তি; এটি অন্যকোনো শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কাজেই কারো আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলা করার বক্তব্য সম্পূর্ণ অবান্তর ও কল্পনাপ্রসূত।

প্রশ্ন: জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর উদ্ভব কেন? এর প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি হলো ১০ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণ, অর্থাৎ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খেয়াং, পাংখো, লুসাই, খুমি এবং চাক–এর একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও বিকাশ, ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক শাসন ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, তথা জুম্ম জনগণের সকল প্রকার পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে

এবং সর্বোপরি দেশের কোনো রাজনৈতিক দল কোনো প্রকারের ন্যূনতম কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে না আসায় এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রে অবজ্ঞা ও চরম অবহেলা দেখানোর ফলে জুম্ম জনগণের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করা হয়।

এই পটভূমিতে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের ব্যাপক সমর্থনে প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ (এমএন) লারমার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) গঠিত হয়। এটি একই সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু যখন একদিকে '১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি' বাংলাদেশের সংবিধানে জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খর্ব করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা বাতিল করা হয়, অন্যদিকে জুম্ম জনগণের ওপর জাতিগত নিপীড়ন-নির্যাতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সর্বোপরি যখন জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার সব ধরনের আবেদন ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়, তখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম করার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে ও অধিকারকামী জুম্ম জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়া হতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জেএসএস-এর নেতৃত্বে 'শান্তি বাহিনী' নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন (গেরিলা গ্রুপ) ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি জন্মলাভ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শান্তিবাহিনী গঠনের পরেও জেএসএস নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু পরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, অব্যাহত সামরিক নির্যাতন ও সন্ত্রাস এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। যার ফলে জেএসএস সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। জেএসএস কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমিস্বত্ব, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

প্রশ্ন: পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণপরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সঙ্গে জেএসএস-এর সম্পর্ক কী? এগুলো কী জেএসএস-এর প্রকাশ্য বা অঙ্গ সংগঠন? সংগঠনগুলোর চলমান আন্দোলন সম্পর্কে আপনাদের মূল্যায়ন?

উত্তর: না, এসব সংগঠন জেএসএস-এর অঙ্গ সংগঠন নয়। এসব সংগঠনের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে জেএসএস এর দাবি-দাওয়ার কোনো সাদৃশ্য থাকলে তা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতার কারণেই হয়েছে বলা যায়। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বার্থে যে কোনো রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের আন্দোলনকে জেএসএস অভিনন্দন জানায়।

* ফুটনোট: এরপর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাতটি শান্তি সংলাপের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি। ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করলে বিলুপ্ত হয় গেরিলা গ্রুপটি। অবসান ঘটে সেনা বাহিনীর সঙ্গে শান্তিবাহিনীর প্রায় দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংঘাত।

তবে নতুন করে আবার শান্তিচুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে পাহাড়িদের মধ্যে শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী সশস্ত্র সংঘর্ষ। কথিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপন্থী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) নামক গ্রুপের নাবালক বিপ্লবীদের অস্ত্রের আঘাতে এখনো রক্ত ঝরছে পাহাড়ে।

আর শান্তিচুক্তি অনুযায়ী সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন গত এক দশকেও হয়নি। সন্তু লারমার ভাষায়, সরকারগুলোর সদিচ্ছার অভাবে এটি অনেক আগেই কাগুজে চুক্তিতে পরিণত হয়েছে।

গেরিলা নেতা সন্তু লারমার হাইড আউটে

অস্ত্র কোনো নির্ধারক শক্তি নয়; নির্ধারক শক্তি হচ্ছে মানুষ। সংগঠিত জনগণ অ্যাটম বোমার চেয়েও শক্তিশালী। মাও সেতুং

১৯৯৪ সালের ৪ মে। পার্বত্য চট্টগ্রাম তখন দারুণ বিক্ষুব্ধ। সেনা বাহিনীর সঙ্গে পাহাড়ি বিদ্রোহী গ্রুপ শান্তিবাহিনীর রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধ লেগেই আছে। তো চারদিন খাগড়াছড়ির পাহাড়ি গ্রাম প্যারাছড়ায় আত্মগোপন করার পর 'ক্লিয়ারেন্স' পাওয়া যায়। ভোর বেলা লক্কড়-ঝক্কর মার্কা ভাড়ার জিপ 'চাঁদের গাড়িতে' করে রওনা হওয়া গেলো পানছড়ির উদ্দেশে। পানছড়ি কলেজের ছাত্ররা পায়ে হাঁটা পথে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়ার পর একজন ত্রিপুরা যুবক গাইড হলেন।

তারপর ছাতা মাথায় মাইলের পর মাইল পাহাড়ি রাস্তা ধরে দ্রুতবেগে অবিরাম পথ চলা। কষ্টকর যাত্রার পুরো সময়টা ছাতা দিয়ে মাথা ঢেকে ক্যামোফ্লাজ করতে হয়; যেন পাহাড়ের ওপর বসানো সেনা বাহিনী আর বি-ডআর -এর ওয়াচ পোস্ট থেকে দুরবিনে এই সাংবাদিক ধরা না পড়ে।

পথে এক পাহাড়ির বাড়িতে সামান্য সময়ের জন্য বিশ্রাম। কথা হয় গাইডের সঙ্গে। মন পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করা হয়, আচ্ছা, আপনারা জুম্মল্যান্ড (পাহাড়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন) প্রতিষ্ঠা করবেন কবে? জবাবে তিনি মুচকি হেসে বলেন, মাও সেতুং তো গেরিলা যুদ্ধের মহানায়ক, তাই না? তিনি কিন্তু কখনোই বলেননি, অমুক বছর চীনে রাষ্ট্র বিপ্লব হবে। রাজনীতিতে এ রকম দিনক্ষণ বলা যায় না।

গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত সাধারণ এক গেরিলা যোদ্ধার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখে চমকিত হতে হয়।

এরপর আবারো হন্টন। পার হতে হয় লোগাং, পুচগাংসহ নানা নাম না জানা পাহাড়ি জনপদ। মাঝে মাঝে পথের ধারে অপেক্ষমাণ সাদা পোশাকে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা গাইডকে 'ক্লিয়ারেন্স' দেন।

হাঁটতে হাঁটতে পথে পড়ে এক গহীন খাদ। খাদ পার হওয়ার জন্য এ পার– ওপার একটি গাছের গুঁড়ি ফেলা। তা-ও আবার কাদায় মাখামাখি হয়ে পিচ্ছিল। শহুরে সাংবাদিকের আশঙ্কা হয়, হয়তো পা পিছলে গহীন খাদে মৃত্যু আসন্ন প্রায়। ইতস্ততা দেখে কিছু বোঝার আগেই গাইড যুবক এক ঝটকায় এই অধমকে তুলে নেন কাঁধে। অবলীলায় পার হয়ে যান খাদ।

তিনি বলেন, আমাদের সব ধরনের ট্রেনিং আছে। দয়া করে একটু জলদি হাঁটুন। সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পে পৌঁছাতে হবে। সন্ধ্যা হলে আর পথ দেখা যাবে না। টর্চ জ্বালানোও ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা বিডিআররা জানে শান্তিবাহিনীর গতিপথ কোনগুলো। টর্চের আলো দেখলে কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই ওরা গুলি করতে শুরু করবে।

আরো কিছুটা এগিয়ে সন্ধ্যার আগে আগে পৌঁছে যাওয়া গেলো ভারত সীমান্তে শান্তিবাহিনীর সদর দফতর দুদুকছড়ায়। বনের ভেতর পাহাড়ি টিলায় অসংখ্য জলপাই রঙের তাঁবু ফেলে তৈরি হয়েছে গেরিলা ছাউনি। একে-৪৭, জি-থ্রি আর নানান রকম স্বয়ংক্রিয় বন্দুকে বিভিন্ন গাছের আড়ালে সতর্ক প্রহরায় রয়েছে জলপাই পোশাকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা।

সাদা পোশাকে শান্তিবাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড সুধাসিন্ধু খীসা এগিয়ে এসে স্বাগত জানান। হারিকেনের আলোয় হাতমুখ ধুয়ে একটি ছোট্ট তাঁবুর ভেতর বসা গেলো। ফ্লাক্স খুলে খেতে দেওয়া হলো কফি। সঙ্গে বিস্কুট আর গোল্ডলিফ সিগারেট।

সুধাসিন্ধু বললেন, শুনেছি, আপনার চা-কফির খুব নেশা। আর আপনি গোল্ডলিফ সিগারেট খান। তাই জঙ্গলের ভেতর অনেক কষ্ট করে এসব যোগাড় করতে হয়েছে!

একটু পরে একজন শান্তিবাহিনীর সৈনিক এসে স্যালুট করে সুধাসিন্ধুকে চাকমা ভাষায় বলেন, 'স্যার' আসছেন।

বলা ভাল, এই 'স্যার' হচ্ছেন শান্তিবাহিনী প্রধান (ফিল্ড কমান্ডার) জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা। শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত নেতা এমএন লারমা, সন্তু লারমা, সুধাসিন্ধু খীসাসহ শীর্ষ নেতারা সবাই ছিলেন স্কুল শিক্ষক। এ কারণেই শান্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধকে বলা হয়, মাস্টার্স রেভ্যুলেশন। আর সেই থেকে শীর্ষ নেতাদের অনুসারীরা 'স্যার' সম্বোধন করেন। তবে সাধারণ অর্থে 'স্যার' বলতে সন্তু লারমাকেই বোঝায়।

খুবই সাদাসিদা পোশাকে বয়স্ক মতোন শুকনো গোছের একজন মানুষ আট-দশজন গেরিলা যোদ্ধা পরিবেষ্টিত হয়ে কাছে এগিয়ে আসেন। হাত বাড়িয়ে বলেন, আমিই সন্তু লারমা!...

সেদিন দুর্গম দুদুকছড়ার হাইড আউটে শান্তিবাহিনী প্রধান সন্তু লারমার সঙ্গে তেমন কথা হয়নি। লিডার বললেন, আপনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতো কষ্ট করে আমাদের ক্যাম্পে এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনার সঙ্গে কথা হবে কাল সকালে।

রাতে সামান্য ভাত-মুরগির মাংস খেয়ে শুয়ে পড়া গেলো। রাত্রিবাসের তঁাবুটিকে পাহারা দিচ্ছিলো শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র যোদ্ধারা। পথক্লান্তিতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে দ্রুত।

একজন গেরিলা কমান্ডার এসে ফিসফিস করে বলেন, সেনাবাহিনী বা বিডিআর ক্যাম্প আক্রমণ করলে আপনি ভয় পাবেন না। গোলাগুলি শুরু হলে আপনি শুধু মাটিতে শুয়ে থাকবেন। আমরা আপনাকে জীবন দিয়ে রক্ষা করবো।...

পরদিন খুব ভোরে চা-নাস্তা খেতে খেতে কথোপকথন হয় সন্তু লারমার সঙ্গে। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি লিখে নেওয়া হচ্ছিলো। তবে অনেক কথাই তখন থাকে অপ্রকাশ্য। লিডার টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন না। আর তাকে সহায়তা করছিলেন শান্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতা রূপায়ন দেওয়ান; শান্তিবাহিনীতে যিনি মেজর রিপ নামে পরিচিত।

কথোপকথনে সন্তু লারমা যা বললেন, তা অনেকটা এরকম:

কথায় কথায় আমাদের বলা হয়, আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভেদপন্থী, রাষ্ট্রদ্রোহী– ইত্যাদি। কিন্তু আমরা তা নই। আমরা এদেশের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। তাছাড়া আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজগুলোতে নিয়মিত জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়। গাওয়া হয় জাতীয় সংগীত। আমাদের স্কুল-কলেজেও একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালিত হয়। আর আমরা কোনোভাবেই ভারতের মদদপুষ্টও নই। আমরা যুদ্ধ পরিচালনা করছি, এ দেশের সাধারণ পাহাড়ি মানুষের জন-সমর্থন নিয়েই। তারাই আমাদের যুদ্ধের মূল শক্তি।

সন্তু লারমা জোর দিয়ে বলেন, আপনি গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবেন, এ রকম কোনো যুদ্ধই কোনো একটি দেশের ওপর নির্ভর করে বা জনসমর্থন ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। আর আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম করছি প্রায় দুই দশক! এটি খুব সাধারণ ব্যাপার নয়।

সন্তু লারমা আরো বলেন, দেখুন জঙ্গল জীবন অনেক কঠিন। আমরা তো আর শখ করে অস্ত্র হাতে তুলে নেইনি। এখানে রোমান্টিকতার কোনো প্রশ্নই নেই। এই যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্ত পথই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি বেছে নিয়েছি। আমরা শান্তিকামী বলেই সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথও খোলা রেখেছি। আর পাকিস্তান আমলের উপনিবেশিক

জাতিগত নিপীড়নের সঙ্গে এই যুদ্ধের পার্থক্য হচ্ছে, তখন পাকিস্তান সরকার এদেশের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। কিন্তু এখন এদেশের সেনাবাহিনী এদেশেরই পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। এটি হচ্ছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে বুলেটে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেনা অপারেশন। আত্মরক্ষার অধিকার তো সকলেরই আছে তাই না? আর আমরা লড়ছি পাহাড়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। তবে সাধারণ বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই।

সন্তু লারমার এটিই ছিলো এদেশের কোনো গণমাধ্যমকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারটিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে লিডারের সঙ্গে গেরিলা পরিবেষ্টিত হয়ে কয়েকটি আলোকচিত্র তোলা হয়। ছবি তোলেন রূপায়ণ দেওয়ান।

দুপুরে ভাত খেয়ে আবারো পানছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ির উদ্দেশে যাত্রা। সন্তু লারমা কিছুটা পথ এগিয়ে দেন। বিদায় বেলায় বলেন, পারলে আমাদের কথা লিখবেন। কেউ আমাদের কথা বলে না!

সে সময় দৈনিক আজকের কাগজে ছবিসহ সাক্ষাৎকারটি হুবহু প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক খবরের কাগজে দুই পর্বে ছাপা হয় সন্তু লারমার প্রথম সাক্ষাৎকারের ইতিবৃত্ত। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি'র তৎকালীন বিশেষ সংবাদদাতা নাদিম কাদির সংস্থার পক্ষে সন্তু লারমার দুটি আলোকচিত্র চড়া দামে কিনে নেন।

এমএন লারমা: একটি ব্যক্তিগত মূল্যায়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও এর সাবেক গেরিলা দল শান্তি বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ (এমএন) লারমা বলেছিলেন, নেতৃত্বের মৃত্যু আছে, আদর্শের মৃত্যু নেই। তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির মহান দেশপ্রেমিক নেতার এই কথাটি যে আক্ষরিক অর্থেই কতটা সত্যি, তা বোঝা যায়, তার মৃত্যুর পরেও জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর আদর্শিক অবস্থানের দৃঢ়তা দেখে।

বাংলাদেশ নামক বাংলা ভাষাভাষীর রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই এমএন লারমা সেই '৭৩ সালেই বুঝেছিলেন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছাড়া ভাষাগত সংখ্যালঘু পাহাড়ি আদিবাসীর মুক্তি নেই। তাই তিনি স্বতন্ত্র সাংসদ ও জনসংহতি সমিতির আহ্বায়ক হিসেবে সংসদ অধিবেশনে তুলে ধরেছিলেন পাঁচ দফা দাবিনামা। এগুলো হচ্ছে:

... 'ক. আমরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সমেত পৃথক অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পেতে চাই। খ. আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার থাকবে, এ রকম শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই। গ. আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে, এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই। ঘ. আমাদের জমি স্বত্ব–জুম চাষের জমি ও কর্ষণযোগ্য সমতল জমির স্বত্ব সংরক্ষিত হয়, এমন শাসন ব্যবস্থা আমরা পেতে চাই। ঙ. বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে যেন কেউ বসতি স্থাপন করতে না পারে, তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই।'...

এই সব দাবিনামার সপক্ষে এমএন লারমা তাঁর সংসদের ভাষণে বলেছিলেন, '...আমাদের দাবি ন্যায়সংগত। বছরকে বছর ধরে ইহা একটি অবহেলিত শাসিত অঞ্চল ছিল। এখন আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল, অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বাস্তবে পেতে চাই।'...

কিন্তু এমএন লারমার দাবি সে সময় চরম অবজ্ঞা করে সরকার।

এমএন লারমাই বাংলাদেশে প্রথম পাহাড়ি আদিবাসী গোষ্ঠীকে সশস্ত্র করে তাঁদের মুক্তির পথ দেখান। তিনিই প্রথম গেরিলা যুদ্ধকে সঠিকভাবে এ দেশের প্রেক্ষাপটে সূত্রায়ন, নেতৃত্বদান ও পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চরম দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ থাকা সত্ত্বেও, গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশলকে ৭০ দশকের চীনাপন্থী বিপ্লবীরা সেই অর্থে সঠিকভাবে সূত্রাবদ্ধ,

নেতৃত্বদান ও পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ সব কারণে সাধারণ জনগণের ক্ষোভকে বিপ্লবী চেতনায় পরিণত করতে না পেরে তারা শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ে ছিলেন জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী-বিপ্লবীতে।

লক্ষণীয় সংসদ অধিবেশনে উত্থাপিত এমএন লারমার ওই পাঁচ দফাই আরো পরে সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফায় পরিণত হয়। এই সংশোধিত পাঁচ দফার ভিত্তিতেই এমএন লারমার মৃত্যুর (১০ নভেম্বর, ১৯৮৩) পরেও অনুজ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমার নেতৃত্বে শান্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধ অব্যাহত রাখে।

একই সঙ্গে শান্তিবাহিনীর মূল দল জনসংহতি সমিতি সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথও খোলা রেখেছিল; যার সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এমএন লারমার জীবদ্দশাতেই।

সংবাদপত্রে এমএন লারমার জীবন-সংগ্রাম ও মৃত্যু সংবাদ:

এমএন লারমার মৃত্যুর আটদিন পর তাঁর নিহত হওয়ার খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক– 'শান্তিবাহিনী' প্রধান মানবেন্দ্র লারমা নিহত– এই শিরোনামে ১৯৮৩ সালের ১৮ নভেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলামে প্রকাশ করে।

প্রকাশিত ওই খবরে বলা হয়: বাংলাদেশ জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন সদস্য, তথাকথিত শান্তিবাহিনীর প্রধান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান মি: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হইয়াছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত্রে আমাদের রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা জানান, মি: লারমা গত ১০ই নভেম্বর সীমান্তের অপর পারে ভারতে ইমারা গ্রামে বাগমারা নামক স্থানে শান্তিবাহিনীর কল্যাণপুর ক্যাম্পে প্রতিদ্বন্দ্বী শান্তিবাহিনীর 'প্রীতি গ্রুপের' সদস্যদের হামলায় নিহত হইয়াছেন।

বিভক্ত শান্তিবাহিনীর মধ্যে মি: মানবেন্দ্র চীনপন্থী ও ঘাতক প্রীতিদলের নেতা প্রীতি চাকমা ভারতপন্থী বলিয়া পরিচিত।

মানবেন্দ্র লারমার সহিত তাঁহার বড় ভাইয়ের শ্যালক মণি চাকমা, খাগড়াছড়ি হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অপর্ণা চরম চাকমা, কল্যাণময় চাকমা ও লেফটেন্যান্ট রিপনসহ শান্তিবাহিনীর আটজন সদস্য ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। শান্তিবাহিনীর ছয়-সাতজন কেন্দ্রীয় নেতাও এ হামলায় আহত হয়।

ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত এই ক্যাম্পে শান্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় নেতা সন্তু লারমা, রূপায়ন দেওয়ান, ঊষাতন তালুকদারসহ অন্যান্য নেতার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহা এখনো জানা যায় নাই। সন্তু লারমাকেই মানবেন্দ্র লারমার পর শীর্ষ নেতা বলিয়া মনে করা হইত।

কল্যাণপুর ক্যাম্প অপারেশনের ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, ক্যাপ্টেন এলিনের নেতৃত্বে প্রীতি গ্রুপের আট-দশজনের একটি সুইসাইডাল স্কোয়াড লারমা গ্রুপের শিবিরে সশস্ত্র অভিযান চালায়। প্রীতি কুমার চাকমা বর্তমানে তাহার দলবল লইয়া পানছড়ি এলাকায় লারমা গ্রুপের সদস্যদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

উল্লেখ্য, গত ১০ই নভেম্বর মতিবান পুলিশ ক্যাম্পের এক মাইল পূর্বে প্রীতি গ্রুপ লারমার মামার বাড়িতে অবস্থানরত শান্তিবাহিনীর সদস্যদের উপর আক্রমণ চালায়। উক্ত আক্রমণে অবশ্য কেহ হতাহত হয় নাই।

মি: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়িয়া তোলেন। সাবেক সংসদ সদস্য মি: রোয়াজা ছিলেন উক্ত সংগঠনের সভাপতি এবং মি: লারমা ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ইতিপূর্বে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির মাধ্যমে মানবেন্দ্র লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত তরুণদের সংগঠিত করেন।

১৯৭০ এর নির্বাচনে মি: লারমা স্বতন্ত্র প্রার্থী রূপে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনেও মি: লারমা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। গণপরিষদে তিনি একটি খসড়া সংবিধান উপস্থাপন করিয়াছিলেন। লারমা সংসদ সদস্য হিসাবে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনাকালে পাহাড়ি ছাত্র সমিতিসহ তরুণদের সহিত তাহার ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

১৯৭৪ সালে মি: লারমা জনসংহতি সমিতির একটি সশস্ত্র গ্রুপ গঠন করেন, পরে উহা শান্তিবাহিনী রূপে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৬ সালে শান্তিবাহিনীর মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। মি: লারমা চীনাপন্থী ও প্রীতি কুমার চাকমা ভারতপন্থী নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে শান্তিবাহিনী সম্পূর্ণ রূপে দ্বিধাবিভক্ত হয়। এই সময় আত্মকলহে শান্তিবাহিনীর শতাধিক সদস্য নিহত হয়। ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বরে, ১৯৮২ সালের আগস্টে এবং ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে দুই গ্রুপের মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়।

মি: মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাত্রাবস্থা হইতেই বামপন্থী রাজনীতির সহিত জড়িত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম চিত্তকিশোর লারমা। তাঁহাদের আদিবাড়ি ছিল কোতয়ালী থানার মহাপুরম গ্রামে। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে ওই এলাকা প্লাবিত হওয়ায় তাহারা পানছড়ি এলাকায় চলিয়া যান। মি: লারমার স্ত্রীর নাম পঙ্কজিনী লারমা। তাহার দুই পুত্র রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নাম জানা যায় নাই।

মি: লারমা ১৯৫৮ সালে মেট্রিক পাস করেন এবং ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ হইতে আইএ এবং ১৯৬৩ সালে বিএ পাস করেন। এ সময় সরকার বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে তাহাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু নবীন অপরাধী হিসাবে তাহার দণ্ড হ্রাস করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে থানায় হাজিরা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় তিনি দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং পরে বিএড ও এলএলবি পাস করেন।

ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি

শান্তিবাহিনীর প্রায় দুই দশকের রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধ আর পাহাড়ি-বাঙালির রক্তের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি। এই শান্তিচুক্তিরও মূল কথা, পাহাড়ে সীমিত আকারে হলেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা। তবে ভূমি সমস্যার সমাধানসহ শান্তিচুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ি আদিবাসী জীবনের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তনই আসেনি, সেটি অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

বৃহত্তর বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবল জোয়ারের বিপরীতে এমএন লারমাই প্রথম জুম্ম (পাহাড়ি) জাতীয়তাবাদী চেতনায় পাহাড়ের ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে সংগঠিত করেছিলেন; যাদের ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সরকার তো মানুষই মনে করেনি, 'উপজাতি' বানিয়ে রেখেছিল। আর স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু তো তাদের বাঙালিই হয়ে যেতে বলেছিলেন!

এ কারণে পাহাড়ি নেতা এমএন লারমা সত্যিকার অর্থেই জুম্ম জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত।

এমএন লারমার ছিন্নপত্র : ঐতিহাসিক দলিল

প্রায় তিন দশক আগে ঘাতক বুলেট কেড়ে নিয়েছে মানবেন্দ্র নারায়ণ (এমএন) লারমার প্রাণ, কিন্তু তিনি আজও মৃত্যুহীন। পাহাড়ের জীবন্ত কিংবদন্তি এই নেতা মিশে আছেন পার্বত্যাঞ্চলের ১৩টি ক্ষুদ্র ভাষাভাষীর লোহিত কণিকার স্ফুলিঙ্গে। আজও যুদ্ধ, সংগ্রাম, আনন্দ, বেদনা আর উৎসবে স্মরিত হয় তার নাম অনেক শ্রদ্ধায়। আজও পাহাড়, অরণ্য, ঝর্নাধারা, দিগন্ত জোড়া আকাশ চমকিত হয় এমএন লারমার নামে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও এর সাবেক গেরিলা গ্রুপ শান্তি বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এমএন লারমা ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর বিভেদপন্থী প্রীতি গ্রুপের হাতে নিহত হন। এর অল্প কিছুদিন আগে তিনি তার অনুজ, সাবেক শান্তিবাহিনী ও বর্তমান জনসংহতি সমিতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমার কাছে কিছু গোপন রাজনৈতিক চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি সন্তু লারমাকে প্রিয় আদরের সম্বোধন 'তুং' নামটি ব্যবহার করেছেন। আর নিজে ব্যবহার করেছেন 'প্রবাহন' ছদ্ম নামটি।

মাও সেতুং চিন্তাধারায় প্রভাবিত, 'জুম্মল্যান্ড' নামক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্নদ্রষ্টা, গেরিলা নেতা এমএন লারমার গভীর প্রজ্ঞা, পাহাড়ি জনগণের মুক্তির আকুতি, শান্তিবাহিনীর অন্তর্কলহ ফুটে উঠেছে এসব চিঠিতে। কয়েকটি চিঠি ছোট; আবার কয়েকটি চিঠি তিন-চার পৃষ্ঠার, কি তারও বড়। বেশ কয়েকটি চিঠিতে তারিখ, সাল ও স্থানের কোনো উল্লেখ নেই।

তবে বিষয়বস্তু থেকে ধরেই নেওয়া যায়, এগুলো সবই ১৯৮৩ সালের মধ্য ও শেষভাগে লেখা। সেনা বাহিনীর সঙ্গে শান্তিবাহিনীর রক্তক্ষয়ী বন্দুক যুদ্ধে পাহাড় তখন দারুণ বিক্ষুব্ধ। আবার শান্তিবাহিনীর লারমা গ্রুপ–প্রীতি গ্রুপের মধ্যেও চলছে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত। পাশাপাশি এমএন লারমার উদ্যোগে চলছে প্রীতি গ্রুপের সঙ্গে সমঝোতা প্রচেষ্টা। আর পার্টির পক্ষ থেকে এই সমঝোতায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন এমএন লারমার যোগ্য সহযোদ্ধা, গেরিলা কমান্ডার সন্তু লারমা।

জনসংহতি সমিতির শীর্ষস্থানীয় সূত্রে পাওয়া এনএন লারমার নিজস্ব বানান রীতিতে চিঠিগুলোর প্রয়োজনীয় খণ্ডাংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। আর ব্রাকেটবন্দি মন্তব্য এই লেখকের।

চিঠি এক: পার্বত্য সমস্যার সমাধান হবে কিভাবে? নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তি পূর্ণ পথে, না কী সশস্ত্র পন্থায় আসবে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি? লারমা গ্রুপ বিরোধী সক্রিয় প্রীতি গ্রুপ (প্রীতি কুমার চাকমা। গিরি, প্রকাশ, দেবেন ও পলাশ– এই চারজন প্রীতি গ্রুপের অন্যতম প্রধান।) এর সঙ্গে কী কোনো সমঝোতা করা যায়? ১৯৮৩ সালের ২৩ মে এসব বিষয়ে এনএন লারমা সহযোদ্ধা সন্তু লারমাকে চিঠিতে লিখছেন:

প্রিয় তুং,

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তুমি, আমি ও গিরি (প্রীতি গ্রুপ-নেতা) আলোচনা করেছি অনেক। শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান, না অশান্তিপূর্ণ পথে সমাধান– এই দুই পথ থেকে কোন পথ নেওয়া হবে। অনেক কথাই হয়েছিল। তবে যে কথা সবচেয়ে বেশি ছিল, অশান্তিপূর্ণ পথে সমাধান করতে হলে পূর্ণ সফলতা অবশ্যই প্রয়োজন। এখন তোমরা কি গিয়ে আলোচনা করে ঠিক করেছ, জানি না। অশান্তিপূর্ণ সমাধানের আগে শান্তিপূর্ণ সমাধানের একটা প্রচেষ্টা নেওয়া যায় কি না, তা তোমরা চিন্তা করেছ কি না, জানি না। তাই এটা চিন্তা করলেও ভাল হবে।...

যাক, কতো কথা লিখতে হয়... মন বলছে, মনে বার বার আঘাত হানছে, আমাদের আন্দোলনে ভাটা পড়েছে, ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। আর তাছাড়া জৈমিনির (ভারত) আশায় থেকে আমাদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাই কিছু একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, কিছু সময়ের জন্য শান্তি যদি পাওয়া যেতো, তাহলে ভালো হতো। আর বিশেষ কিছু লিখলাম না।

ইতি প্রবাহন।

বি. দ্র. তুমি আর আমি লক্ষ্য (প্রীতি গ্রুপের হিট লিস্টের টার্গেট)। তাই ধীর কৌশলে অবস্থার সাথে এগিয়ে চলাই আমাদের উচিত হবে।

চিঠি দুই: একদিকে শান্তিবাহিনীর লারমা গ্রুপের হাইড আউটগুলোতে প্রীতিগ্রুপ মাঝে মধ্যেই চোরাগুপ্তা হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে সামরিক জান্তা এইচএম এরশাদের হাজার হাজার সেনা বাহিনীও লারমা গ্রুপকে দমন করতে তৎপর। এমন বৈরী অবস্থায় আবার প্রীতি গ্রুপের সঙ্গে লারমা গ্রুপের সমঝোতা-চেষ্টাও চলছে। এ সব বিষয়ে এমএন লারমা পরবর্তী চিঠিতে লিখছেন:

প্রিয় তুং, ...সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যে কথা হলো, যা সেও (গিরি, প্রকাশ, দেবেন ও পলাশ– প্রীতি গ্রুপের এই চার প্রধান নেতার মধ্যে কোনো এক নেতা) নিজে বলল, তা হচ্ছে– ক. প্রথমে দুপক্ষের মধ্যে বিরোধী প্রচার বন্ধ করা, যাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, খ. কার্যকর পরিষদের বৈঠক করানো, গ. সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্টদের বৈঠক এবং ঘ. সবশেষে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। এ সব আমিও বলেছি, সেও বলেছে।

এছাড়া তাকে বলেছি, বিশেষ সেক্টরের শ্রী পলাশকে (প্রীতি গ্রুপ-নেতা) কেন্দ্রের সাথে (শান্তিবাহিনীর লারমা গ্রুপের মূল ধারায়) সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থায় তুমি আনতে পারবে কি না? উত্তরে সে বলেছে, পারব অথবা পারব না–এ রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া কঠিন। কারণ শ্রী পলাশ তো একা নয়। তাকে কেন্দ্র করে আরও রয়েছে। তবে আমি চেষ্টা করব।...

চিঠি তিন: ১৯৮৩ সালে মে মাসে প্রীতি গ্রুপের সঙ্গে লারমা গ্রুপের সমঝোতা বৈঠকের অগ্রগতি হয়। এমএন লারমা সিদ্ধান্ত নেন, প্রীতি গ্রুপের একাংশের কমান্ডার গিরির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তিনি বিশ্বস্ত অনুচর সন্তু লারমাকে পাঠাবেন। এ বিষয়ে ওই বছরের ৩১ মে তিনি সন্তু লারমাকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে লিখেন:

প্রিয় তুং,

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ এই, শ্রীগিরি (প্রীতিগ্রুপ নেতা) সেখানে আসছে। তার সঙ্গে তুমি স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে। উত্তেজিতভাবে অথবা কোন বিষয়ে কথা বলতে বলতে উত্তেজিতভাবে উত্তর দিও না। কৌশলগতভাবে এবং কূটনীতির কৌশল প্রয়োগ করে অবশ্যই কথা বলবে। শ্রীগিরির সাথে সেখানের অন্য সঙ্গীরা যাতে স্বাভাবিক ব্যবহার করে, তার ব্যবস্থা করবে। অস্বাভাবিক ব্যবহার করে লাভ হবে না। এই আমার অনুরোধ থাকল। ...

একটা কথা মনে রাখবে, আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি। জৈমিনি (ভারত) সরে যাবার জন্যই এ কাজ করতে পারে, অথবা বাংলাদেশ সরকার পার্টির (জনসংহতি সমিতি) অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে এসব করছে। তবে কোনটি সঠিক, বলার সময় এখনো আসেনি। তবে এটা বাস্তব সত্যি যে, আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি।

তাই কথা বেফাঁসে শ্রীগিরির নিকট বলা উচিত হবে না। বিশেষ করে জৈমিনি (ভারত) সম্পর্কে। (সে) জৈমিনির পেইড এজেন্ট যে হয়নি, এটা সন্দেহের বাইরে নয়। জৈমিনি ওয়েট অ্যান্ড সি বললে পার্টির (জনসংহতি সমিতি) ভাঙন না হোক বাহ্যিকভাবে, আসলে সে কাজই হবে। সুতরাং পার্টি

যাতে না ভাঙে তজ্জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এ জন্য ত্যাগ স্বীকার তোমার ও আমার করতে হবে। যদি পার্টির দায়িত্ব থেকে সরে যেতে হয়, আমরা সরে যাব– এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই হোক আমাদের।...

ইতি- প্রবাহন।

চিঠি চার: জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর বিভক্তি ঠেকানোর চেষ্টার পাশাপাশি এরশাদ সরকারের সঙ্গে শান্তি-সংলাপের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছিলেন এমএন লারমা। তারিখবিহীন এরপরের এক চিঠিতে 'প্রিয় তুং'কে তিনি লিখেন:

... বার বার একই কথা হচ্ছে, তুমিও অধৈর্য ও অসহিষ্ণু হয়ো না। এই জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হবে। পার্টির স্থিতিশীলতা আসার পর ঠিক করতে হবে, আন্দোলন চলবে, না আন্দোলন স্থগিত হবে।

আন্দোলন চললে অর্থ ও খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো পূরণ হবে কি না, সবই যাচাই করতে হবে। তাই আন্দোলন স্থগিত হবে বলে তো যখন-তখন তা করা যাবে না। যাতে বাংলাদেশ সরকার সহানুভূতির সহকারে গ্রহণ করে, তজ্জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েই তবে আন্দোলন স্থগিত করা সম্ভব।

অর্থ ও খাদ্য সংকট আমাদের আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এটা প্রত্যেক কর্মীকেও অনুভব করতে হবে। আবেগ প্রবণ হয়ে বিবেক সাড়া দেয় না বলে কঠোর হওয়া যাবে না, বাস্তবতাকেই মানতে হবে। অর্থ ও খাদ্য সংকট এড়াতে পারলে টিকে থাকা সম্ভব এটা বুঝি।

তাই সারসংক্ষেপ হচ্ছে– বর্তমান সমস্যা সমাধানে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আন্দোলন চলবে, না থামবে। কারণ জৈমিনির (ভারত) আশায় থাকা যাবে না।...

চিঠি পাঁচ: এর পরের আরেক চিঠিতে এমএন লারমা প্রকাশ করেছেন তার আদর্শিক দৃঢ় অবস্থানের কথা।

...আমরা সংগ্রাম করছি আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ বজায় রাখার জন্য। আমাদের জাতি তো আর ধ্বংস হচ্ছে না। ধ্বংস হচ্ছে রাজনৈতিক অস্তিত্ব। এই দোষ কার? এই দোষ কি আমাদের? কখনোই না। এ জন্য ১৯৪৭ সালই দায়ী। ১৯৪৭ সালই (দেশ বিভাগ) আমাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে।

তাই এসব বিচার করে আমাদের ঠিক করে নিতে হবে, পার্টির বর্তমান সমস্যা সমাধানের পর ভাবাবেগ নয়, বাস্তবতার নিরিখেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।... আমরা টেরোরিস্ট নই। আমরা আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থাৎ জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে সংগ্রামী। আমরা কারো টেরোরিস্ট হবো না, হতেও চাই না।...

একটি লোমহর্ষক গণহত্যার কাহিনী

ফুন্দুরী রাঙ্গা ঝুরবো ফেগ/ তম্মা মইলে মুইদো এজ...চাকমা লোকগীতি...রাঙালেজের কান্ত পাখি/ তোমার মা মারা গেলে আমার কাছে এসো...

কোনো পেশাগত কারণে নয়, স্রেফ বেড়াতে যাওয়ার জন্যই একবার পাহাড়ে যাওয়া হয় চাকমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব বিঝুর আমন্ত্রণে। পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির উদ্দেশে বিশাল দলবলসহ ১৯৯২ সালের ১১ এপ্রিল সকালে কলাবাগান থেকে লক্কড়-ঝক্কর বাস 'ডলফিন' ছাড়ে। সেটা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরেরও বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। পাহাড় তখন দারুণ অশান্ত, যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ। জনসংহতি সমিতির সাবেক গেরিলা গ্রুপ শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সেনা বাহিনী সদস্যদের রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধ লেগেই আছে।

পাশের আসনের সঙ্গী প্রধীরদা (প্রধীর তালুকদার, অখণ্ড পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বা পিসিপির সাবেক নেতা, পরে শান্তিবাহিনীতে যোগ দেন) পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। বলছিলেন জলপাই শাসনের ভয়াল রূপ। আশৈশব দেখা তার চিরচেনা পাহাড় দিনের পর দিন বহিরাগত বাঙালি সেটেলারদের দখলে যাওয়ার বেদনাদায়ক ইতিহাস।

কুমিল্লা সেনানিবাস পার হওয়ার পথেই বোঝা যায় আতংকিত জনপদে প্রবেশের যন্ত্রণা। বেশ কয়েক জায়গায় বাঁশ-কল দিয়ে গাড়ি আটকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা যাত্রীদের নাম-ধাম ইত্যাদির তালিকা তৈরি করে। লাগেজ-ব্যাগেজও তল্লাসি হয় কয়েকবার।

সফরসঙ্গী ইলিয়াস ভাই (প্রয়াত লেখক আখতারুজ্জামন ইলিয়াস), আনু ভাই (অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ), শাজাহান ভাই (প্রয়াত ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাজাহান), সারা আপা (ব্যারিস্টার সারা হোসেন), আহাদ ভাই (আহাদ আহমেদ খন্দকার, তৎকালীন অখণ্ড ছাত্র ফেডারেশন সভাপতি)– তারাই নিরাপত্তা বাহিনীর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

বাস রামগড় প্রবেশের সময় চোখে পড়ে পথের দুপাশের উঁচু উঁচু পাহাড়ে এক কিলোমিটার অন্তর অন্তর নিরাপত্তা বাহিনীর ওয়াচ-পোস্ট।

বাস খাগড়াছড়ি পৌঁছানোর আগেই পথের মধ্যে দু-এক জায়াগায় কয়েকজন পাহাড়ি বাস থামিয়ে সঙ্গী অপরাপর পাহাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথন সেরে নেন। এভাবে বাসের মধ্যেই লোকমুখে জানা হয়ে যায় সেই লোমহর্ষক গণহত্যার কাহিনী।

আগের দিনই (১০ এপ্রিল) খাগড়াছড়ির পানছড়ির লোগাং নামক পাহাড়ি গ্রামে সেনাবাহিনী, ভিডিপি, আনসার ও সেটেলাররা একযোগে আক্রমণ চালায়। নিরস্ত্র, হত-দরিদ্র সাধারণ পাহাড়িদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নির্বিচারে গুলি করা হয়। সেটেলারদের দায়ের আঘাতে প্রাণ যায় অনেকের। হতাহতের সংখ্যা কতো হবে, কেউ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে পারছে না। পুরো এলাকায় নাকি কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে– ইত্যাদি ইত্যাদি।

খাগড়াছড়ি পৌঁছানোর পর পিসিপির ছেলে-মেয়েরা ফুল দিয়ে স্বাগত জানায়। তবে লোগাঙের কথা শুনে সবারই চোখ-মুখ কেমন যেন শুকনো বলে মনে হয়। শান্তিবাহিনীর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ, আর নিরাপত্তা বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের আশংকায় ছোট্ট পাহাড়ি শহর খাগড়াছড়ি একেবারেই সুনসান হয়ে পড়ে। ঝপ করে সন্ধ্যা নামে কালা পাহাড়ের দেশে।

জেলা সার্কিট হাউজে অতিথিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাড়ে সাতটার বিবিসি খাগড়াছড়ি সংবাদদাতার বরাত দিয়ে প্রচার করে উল্টো খবর। ওই খবরে বলা হয় লোগাঙে নাকি শান্তিবাহিনীর আক্রমণে মাত্র ১০ জন পাহাড়ি ও তিনজন বাঙালিসহ মোট ১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

সাংবাদিক হওয়ার সুবাদে জানা ছিলো, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান– এই তিন পার্বত্য জেলার সাংবাদিকদের তখন আসলে নিয়ন্ত্রণ করতো নিরাপত্তাবাহিনী। সেনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে সংবাদ পরিবেশনের উপায় ছিলো না। সব মিলিয়ে বিবিসির খবর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।...

সার্কিট হাউজে যখন অতিথিদের রাতের খাবার হিসেবে পাহাড়ি ছেলে-মেয়েরা প্লেটে পোলাও-মাংস তুলে দিচ্ছিলেন, তখন বাইরের বারান্দায় দেখা মেলে এক গামলা মুড়ি খাওয়ায় রত দরিদ্র একজন পাহাড়ি লোককে। কোলে একরত্তি এক দুধের শিশু। লোকটিকে ক্লান্তি আর অজানা এক অনুভূতি ঘিরে রাখে। সে যত না মুড়ি খায়, তার চেয়েও বেশি পানি খায় ঢক ঢক করে। কোলের শিশুটিকেও পানি খাওয়ায় কয়েকবার।

তার পরিচর্যা করছিলো যে সব ছেলে-মেয়ে তাদের কাছ থেকে জানা গেলো, এই ভাগ্যহতের ইতিকথা। দ্রুত নোট প্যাড বের করে টুকে নেয়া হতে থাকে সেই বিস্মৃত নামের পাহাড়িটির কথা।

লোকটি লোগাং গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, প্রাণে বেঁচে যাওয়া সৌভাগ্যবানদের একজন।

তাদের গ্রামে আক্রমণ হতেই শিশুটিকে কোলে করে দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে প্রায় ৩০ কিলিমিটার পথ পাড়ি দিয়ে প্রথমে পৌঁছান সদরে। পিসিপির

নেতারা সার্কিট হাউজে আছে– এই খবর শুনে আসেন এখানে। অনর্গল চাকমা ভাষায় শুধু একটা কথাই বলেন তিনি, বাবারা আমাকে একটু আশ্রয় দাও। চিদরেরা (নিরাপত্তা বাহিনী) আমার কথা জানতে পারলে হয়তো আমাকেও তারা মেরে ফেলবে!

ছাত্রনেতারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে সিদ্ধান্ত নেন, পিসিপির কাছে ভাষ্য দেয়ার অপরাধে লোকটিকে নিরাপত্তা বাহিনী হয়তো ছেড়ে কথা বলবে না। তাই দ্রুত তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কোনো একটি নিরাপদ আশ্রয়ে। আহাদ ভাইয়ের ক্যামেরা ধার করে লোকটির কয়েকটি ফটো নেয়া হয়।

সেদিন রাত কাটে বর্ষীয়ান পাহাড়ি নেতা অনন্ত মাস্টার তথা রামগড়ের স্কুল শিক্ষক অনন্ত বিহারী খীসার নারানখাইয়ার বাসায়। উনি অখণ্ড পিসিপির সাবেক নেতা, বর্তমান শান্তিচুক্তি বিরোধী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফের আহ্বায়ক প্রসিত বিকাশ খীসার বাবা।

পরদিন ১২ এপ্রিল ছিলো ফুল বিঝু। খুব ভোরে নাস্তার টেবিলে অনন্ত মাস্টার সুন্দর করে বুঝিয়ে বলছিলেন ফুল বিঝু, মূল বিঝু ও গজ্যাপজ্যা বিঝুর কথা।

এমন সময় কোথা থেকে যেন একদল পাহাড়ি শিশু-কিশোর কিচির মিচির করতে করতে হাজির হয় সেখানে। ঝুপ ঝুপ করে সকলে অনন্ত মাস্টারকে করে ফুল বিঝুর প্রণাম। বাঙাল অতিথির দিকে ওরা ফিরেও তাকায় না।

সার্কিট হাউজে এসে শোনা গেলো ইলিয়াস ভাই, আনু ভাই, শাজাহান ভাই– সবাই পিসিপির নেতাদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ওই সকালেই লোগাং যাওয়া হবে। সরেজমিনে দেখা হবে আসলে কি হয়েছে সেখানে।

কয়েকটি ভাঙাচোরা জিপ (স্থানীয় নাম চাঁদের গাড়ি) ভাড়া করে রওনা দেয়া হয় লোগাঙের উদ্দেশে।

আবারও পথে পথে তল্লাসি, জেরা, তালিকা নির্মাণ– ইত্যাদি। লোগাঙের আগেই চাঁদের গাড়িগুলোকে আটকে দেয়া হয় পানছড়ি বাজার সংলগ্ন সেনা চেক পোস্টে।

সেখানে হাজির হন ৩৩ নম্বর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোন কমান্ডার মেজর খালিদ রেজা। তিনি তখন পানছড়ির ক্যাম্পের দায়িত্বে। লোগাং যাওয়া না যাওয়ার প্রশ্নে তুমুল তর্কাতর্কি বাধে দুপক্ষের মধ্যে।

মেজর খালিদের কথা একটাই, লোগাঙে যাওয়া নাকি নিরাপদ নয়। যে কোনো মুহূর্তে সেখানে শান্তিবাহিনী আবারও পাল্টা হামলা করতে পারে।

তাছাড়া তার সন্দেহ, এই দলটি বোধহয় শান্তিবাহিনীর আমন্ত্রণে লোগাং যাওয়ার জন্যই ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি এসেছে। বিঝু-টিঝু আসলে নাকি ফালতু অজুহাত!

তর্কাতর্কির মুহূর্তে সে সময়ের পিসিপির নেতা (বর্তমানে ইউপিডিএফের দলছুট নেতা) সঞ্চয় চাকমাকে দেখা যায় চেক পোস্টের কাছেই একজন পাহাড়ি লোকের সঙ্গে কথা বলতে। লোকটির পিঠে এক টুকরো কাপড়ে বাঁধা ছোট্ট একটি শিশু। তার হাত ধরে আছে আরো এক শিশু। তার সর্বাঙ্গে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ছিট।

কথা হচ্ছিল ফিসফিসিয়ে। সেখানে উপস্থিত হতেই লোকটির কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি বুঝে সঞ্চয়কে ক্যামেরা দিয়ে বলা হয় লোকটির একটি ফটো তুলে রাখতে। আর তার ভাষ্য সবই যেন সে নোট করে রাখে।

পরে জানা যায়, সেও লোগাং গণহত্যার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী। সামান্য এক গ্রাম্য কোন্দলকে উপলক্ষ করে সেটেলার ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন একসঙ্গে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরায় লোগাং গ্রামে। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন গুলি চালায়, আর সেটেলাররা কসাইয়ের মতো কুপিয়ে কাটে নিরপরাধ পাহাড়িদের। প্রাণে বেঁচে যাওয়া লোকটির চোখের সামনেই কুপিয়ে খুন করা হয় তার স্ত্রী ও এক শিশুকে। কোনো রকমে গহীন জঙ্গলে শিশু দুটিকে নিয়ে লুকিয়ে থেকে প্রাণে রক্ষা পান। জঙ্গলে পালানোর সময়ে বুনো কাঁটার আঘাতে তার ছিঁড়ে যায় সর্বাঙ্গ। গত দুদিন তার দানা-পানি কিছুই জোটেনি।

সঞ্চয় তাকে পকেট থেকে সামান্য টাকা দিয়ে খাবার কিনে বাচ্চাদের খাওয়াতে বলে। আর পরামর্শ দেয়, অন্য কোনো পাহাড়ি গ্রামে আপাতত লুকিয়ে থাকতে।

সেদিন আর লোগাং যাওয়া হয়নি। তবে খবংপুইজ্জা নামক পাহাড়ি গ্রামে রাতে দেখা মেলে লোগাং গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী আরো কয়েকজনের।

এদের মধ্যে এক কিশোরও রয়েছে, যার মা-বাবা, ভাই-বোন সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে থেকে দূর থেকে সে প্রত্যক্ষ করে এই বেদনাদায়ক নৃশংস দৃশ্য। রাতে ইয়ং-স্টার ক্লাবে পিসিপি নেতা প্রধীরদা কাপড়ে মুড়িয়ে নিয়ে আসেন আগুনে পুড়ে যাওয়া এক শিশুর কংকাল। লোগাং হত্যাযজ্ঞ এই নাম না জানা অবোধ শিশুটিকেও রেহাই দেয়নি।

পরে ঢাকায় ফিরে আরো এক সহকর্মী প্রিসিলা রাজের সঙ্গে 'পাহাড়ে বিপন্ন জনপদ : শোকার্ত লোগাং' শীর্ষক দুই পর্বের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ

করা হয় সাপ্তাহিক 'প্রিয় প্রজন্মে' (তখন এর সম্পাদক ছিলেন ফজলুল বারী, বর্তমানে প্রবাসী)।

সেখানে স্থানীয় একজন স্কুল শিক্ষিকা, পানছড়ি হেলথ কমপ্লেক্সের সরকারি চিকিৎসক, খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি আহত কয়েকজনসহ অন্তত ১০ জন প্রত্যক্ষদর্শীকে উদ্ধৃত করে জানানো হয়, লোগাং গণহত্যার লোমহর্ষক সব তথ্য। জানানো হয়, পাহাড়ের অসুস্থ রাজনীতি এই একটি গণহত্যাতেই কেড়ে নিয়েছে অন্তত ২০০ জন নিরপরাধ পাহাড়ির জীবন। নিখোঁজ ও আহতদের একটি আনুমানিক সংখ্যাও উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনটিতে। পাশাপাশি দেয়া হয় স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভাষ্য।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরই পরই ফজলুল বারী ভাইয়ের ওপর ঊর্ধ্বতন মহলের চাপ আসে। জানা যায়, সেনা সদস্যরা সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের সব কয়েকটি প্রিয় প্রজন্মের কপি কিনে ফেলেছিলো, যেন এর কোনো সংখ্যাই আর সাধারণ পাঠকের হাতে না পৌঁছে।

তবে পাহাড়ি বন্ধুরা প্রতিবেদনটি ফটোকপি করে নিজস্ব উদ্যোগে পাহাড়ে বিলি করেন। প্রচার করেন ওই প্রতিবেদনটি। এই কাজ করতে গিয়ে সেসময় পিসিপি নেতা সঞ্চয় চাকমা জগন্নাথ হল থেকে 'শান্তিবাহিনী' অভিযোগে প্রথমবারের মতো গ্রেফতারও হন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্র।

বলা বাহুল্য, সেবার আর বিঝু উৎসব দেখা হয়নি। লোগাঙের শোকে পাহাড়িরা বিঝু বর্জন করেন সেবার।

কল্পনা চাকমা এখন কোথায়?

ঝিমিত ঝিমিত জুনি জ্বলে / মুড়োর দেজর দেবার তলে/ এই মুড়ো জনম আমার, এই মুড়ো মরণ/ এই মুড়ো ছাড়ি গেলে/ ন' বাঁচিব জীবন...চাকমা গান... ঝিকমিকি জোনাকি জ্বলছে ওই দেখ আমার পাহাড়ের দেশে, এই পাহাড়েই আমার জন্মমৃত্যু, পাহাড় ছেড়ে গেলে আমি কী করে বাঁচবো বলো?...

পাহাড়, অরণ্য, ঝর্নাধারার নিসর্গ ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম বেড়াতে গিয়ে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। কাপ্তাই লেক, চাকমা রাজবাড়ি, সুবলঙের জলপ্রপাত, আকাশছোঁয়া চিম্বুক পাহাড়, ছবির চেয়েও সুন্দর বিলাইছড়ির জগ্গাছড়ার নির্মল পাহাড়ি গ্রাম, কি আলুটিলা বা হেতমুড়োর পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য মুগ্ধ না করে ছাড়ে না।

আর যারা আরেকটু অনুসন্ধিৎসু হবেন, তারা দেখবেন অন্য এক বেদনা বিধুর পাহাড়... শুনবেন চাকমা লোক গানে বলা পাহাড়ি মানুষের বঞ্চনার কথা।

তখন হয়তো চোখ বুজলেই আকাশ সমান সবুজ পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যাবে কালচে লাল ছোপ ছোপ মানুষের রক্তচিহ্ন। গহীন অরণ্যের গভীরে হয়তো কান পাতলে শোনা যাবে, কবে কোথাও নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে যাওয়া মেশিনগানের প্রতিধ্বনিত গুলির আওয়াজ... তখন হয়তো ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ পাগল প্রায় করে ফেলবে আপনাকে। কাঁচের মতো স্বচ্ছ কাপ্তাই লেকের পানি পান করতে গিয়ে হয়তো লোনা ঠেকবে এর স্বাদ... মনে হতে পারে এই লেকের পানির উৎস কর্ণফুলি নদী নয়... দুঃখী পাহাড়ির চোখের লোনা অশ্রুতে সৃষ্টি এই কৃত্রিম লেক। আপনার হয়তো মনে পড়ে যেতে পারে হারিয়ে যাওয়া দুর্গম বাঘাইছড়ির পাহাড়ি মেয়ে কল্পনা চাকমার কথা।

গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে পাহাড়ে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে তথ্য-সংবাদ সংগ্রহ করার সুবাদে পার্বত্যাঞ্চল বিষয়ে সমতলের মানুষের অনেক কৌতূহলী প্রশ্নে মুখোমুখি হতে হয়েছে, এর অধিকাংশ প্রশ্ন শুধু কল্পনা চাকমাকেই নিয়ে। প্রশ্নগুলো অনেকটা এরকম:

আচ্ছা, কল্পনা চাকমাকে অপহরণ (১৯৯৬ সালের ১২ জুন) করেছে কারা? পাহাড়িদের সাবেক গেরিলা গ্রুপ শান্তিবাহিনীই না কী তাকে অপহরণ করে

রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য সেনা বাহিনীর ওপর দোষ চাপাচ্ছে? সেনা বাহিনীই বা তাকে অপহরণ করবে কেন? তাদের লাভ কি? কল্পনা চাকমা না কী এখন ভারতের ত্রিপুরায়? তিনি এখন কোথায়?

এসব প্রশ্নের জবাবে অতি বিনয়ের সঙ্গে সংক্ষেপে যা বলতে চেষ্টা করা হয়েছে, তা হচ্ছে:

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এই তিন জেলা নিয়ে গড়ে ওঠা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আগে (১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর) প্রায় দুদশক ধরে রক্তক্ষয়ী বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে সেনা বাহিনীর সঙ্গে শান্তিবাহিনীর। হয়েছে লোগাং, নান্যাচর, লংগদু, বরকল, কাউখালি, পানছড়ি, দিঘিনালাসহ আরো অনেক গণহত্যার পর গণহত্যা, অপহরণের পর অপহরণ, ধর্ষণ আর গণধর্ষণ। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলেছে লোভী মানুষের লেলিহান অগ্নি শিখায়।

প্রায় ৭০ হাজার পাহাড়ি মানুষকে শুধুমাত্র জীবনটুকু সম্বল করে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিতে হয়েছে ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরে। যাদের এক সময় ছিলো পাহাড়ের মতো মুক্ত জীবন, সাজানো-গুছানো বাড়ি-ঘর, জমি-জিরাত, সেগুন কী কাঁঠাল বাগান, শরণার্থী শিবিরে এসে ঘিঞ্জি বস্তিঘরে একেবারে ভিখিরির মতো দীর্ঘ একযুগ সামান্য রেশনের জন্য হাত পাততে হয়েছে তাদের!

মানুষ মরেছে গুলিতে, শরণার্থী শিবিরে– একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে। এক-মুঠো চালের চেয়েও তখন বুঝি সস্তা ছিলো মানুষের জীবন!

এমন যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত আড়াই দশকের অস্থির অনিশ্চিত পাহাড়ে কল্পনা চাকমার আরো কতো সহযাত্রী নিখোঁজ হয়েছে, হারিয়ে গেছে কতো শত হাজার কল্পনা চাকমা, নিখোঁজ হয়েছে কতো কল্পনার মা, কী বাবা, ভাই, বন্ধু বা স্বজন। কেউ খবর রাখেনি এসব নিখোঁজ সংবাদের।

হয়তো কল্পনা চাকমা হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী ছিলেন বলে তাকে নিয়ে তখন এতো হইচই হয়। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের কিছুদিন আগেই এই অপহরণের ঘটনা ঘটে বলে তাকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় হয় বিস্তর লেখালেখি। সে সময় তাকে উদ্ধারের দাবিতে একই সঙ্গে পাহাড়ে ও সমতলে গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিলো– এটিও এর কারণ হতে পারে। আর নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এনজিওগুলোর মানবাধিকার তথা আদিবাসী ইস্যুতে দাতাগোষ্ঠির কাছ থেকে বিদেশী মুদ্রা হাতিয়ে নেওয়ার বাণিজ্যিক স্বার্থে তুমুল চিৎকার তো ছিলোই।

কল্পনা চাকমা অপহৃত হওয়ার কিছুদিন পর (সম্ভবত সেটা ১৯৯৬ সালের জুনের শেষে অথবা জুলাইয়ের শুরুতে) পেশাগত কারণে রাঙামাটির বাঘাইছড়ির নিউ লাইল্লাঘোনা গ্রামে কল্পনাদের বাড়িতে যাওয়া হয়। কল্পনা চাকমাকে উদ্ধারের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে অখণ্ড পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের যে চারজন তরুণ ছাত্রকর্মী প্রাণ দিয়েছিলেন, রূপকারী গ্রামের স্কুল মাঠে সেদিন আয়োজন করা হয়েছিলো তাদের স্মরণসভা।

শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদে ছোট্ট একটা স্কুল মাঠে অনেক দূর-দুরান্ত থেকে হতদরিদ্র পাহাড়ি নারী-পুরুষ, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে, এমন কি অনেক বুড়ো-বুড়িও পাহাড় জঙ্গল ভেঙে এসেছিলেন সেই স্মরণ সভায়।

পুরো স্কুল মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ। চাকমারা ছাড়াও মারমা ও ত্রিপুরারা আছেন সেখানে। এটিই দেখা পাহাড়ি জনতার প্রথম সমাবেশ নয়। তবে এটিই বোধহয় এখনো দেখা সবচেয়ে বেদানার্ত মানুষের পাথর-চাপা কান্নার সমাবেশ।

কল্পনা চাকমাকে নিয়ে রূপালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামান্য এক শিক্ষক ব্রহ্মকুমার (লালফা) চাকমা খোলা গলায় গাইলেন গান। পুরো সমাবেশে ওঠে শব্দহীন কান্নার রোল। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিপ্লবী নেতা-নেত্রীরাও বক্তব্য দিতে গিয়ে বার বার কথার খেই হারিয়ে ফেলেন, গলা ধরে আসে কান্নায়।

মাইকে যখন শোনা হয় বক্তব্যের পালা পড়েছে এবার ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিকের, তখন ঝাঁপসা হয়ে আসা চশমার কাঁচ মুছে কোনো রকমে জানিয়ে দেওয়া হয় নেতিবাচক মনোভাব।

ওই স্মরণসভা শেষে চারজন শহীদ স্মরণে স্কুল মাঠের মাথায় প্রতিষ্ঠা করা হয় চারটি স্তম্ভের স্মৃতির মিনার।

আরো পরে কল্পনা চাকমার বাড়ি যাওয়ার পথে পাহাড়ি বন্ধুরাসহ এক বৌদ্ধ মন্দিরে (কিয়াং) বিশ্রামের সময় কথা হয় অতি বৃদ্ধা এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সাধু মা নামেই যিনি সেখানে পরিচিত, কথা বলেন ক্ষীণ কণ্ঠে ভাঙা ভাঙা বাংলায়, তার চাকমা উচ্চারণেও ফুটে ওঠে আদি চাকমা ভাষার বোল।

তিনিও জানেন কল্পনার অপহরণের কথা। তবে ভুল করে তিনি ভেবেছিলেন, এরা বোধহয় কল্পনার উদ্ধারকারী দল।

করজোড়ে কপালে প্রণাম ঠেকিয়ে বলেন, তোমারাই বোধহয় ভগবান!...

এরপর সন্ধ্যা থেকে মাইলের পর মাইল পাহাড় ভেঙে ঝির ঝির বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল দুর্গম পথ ধরে সামান্য টর্চের আলো ধরে পথচলা। জুতো হাতে

প্যান্ট গুটিয়ে কাঁদামাখা পিচ্ছিল পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আছাড় খেতে খেতে কল্পনাদের বাড়ি পৌঁছে যাওয়া।

এক চিলতে উঠোন ঘিরে ছোট একটি কুঁড়ে ঘর, অভাবের চিহ্ন সর্বত্র প্রকট। ঘুটঘুটে অন্ধকারে হারিকেন আর টর্চ হাতে পুরো গ্রাম ভেঙে পরে আগত বাহিনীকে দেখতে। কথা হয় কল্পনার জুম (পাহাড়ের ঢালে বিশেষ ধরনের চাষাবাদ) চাষি দুই ভাইয়ের সঙ্গে। তখনো পুরো পরিবারটির আতংক কাটেনি। নিরাপত্তার জন্য বৃদ্ধ মা বাঁধুনী চাকমাসহ তাদের রাত কাটছে অন্যের বাড়িতে।

তারা দু'জন অনর্গল চাকমায় বর্ণনা করেন কী ভাবে লেফটেনেন্ট ফেরদৌসের নেতৃত্বে পোশাকধারী সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যায় সেদিন রাতে তাদের আদরের ছোটবোন কল্পনাকে।

একভাই বেশ কিছুদূর সন্ত্রাসীদের অনুসরণ করলে ব্রাশ ফায়ার করে ওরা। প্রাণ বাঁচাতে কাচালং নদীতে ঝাঁপিয়ে পরে জীবন রক্ষা হয় তার। কিন্তু এরপর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি তাদের বোনের।

কল্পনাদের বাড়ির উঠোনেই কথা হয় নানান বয়সী গ্রামের মানুষের সঙ্গে, এমন কি সাদা পোশাকের একজন শান্তিবাহিনীর ক্যাডারের সঙ্গেও। সেদিন কল্পনার মা বাঁধুনী চাকমার দেখা মেলেনি। তবে আরো কিছুদিন পরে বৃদ্ধ মা বারবার চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, তার একমাত্র মেয়ে অপহরণের পর এই অপহরণকে নিয়ে হেলিকপ্টার-রাজনীতির কথা।

পরে বাঘাইছড়ির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, রাঙামাটি পুলিশ সুপার, সেনা কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের ভাষ্যসহ দৈনিক আজকের কাগজে কল্পনা চাকমা অপহরণের ওপরে যে কয়েকটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিলো, এর একটির সূচনা কথা ছিলো: রক্তের ধারা পেছনে যায় না!

সেটেলার! সেটেলার! সেটেলার!...

আমার দেশ্চান হীরে-মানিক/ সোনা রূপোয় ভরা/ আমার দেশ্চান মুড়ো-মুড়ি/ গাঙে-ছড়ায় ভরা...চাকমা গান

১৯৯৬ সালের জুনের পরে কোনো একটি সময়। পাহাড়ি নেত্রী কল্পনা চাকমা মাত্র অপহরণ হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম তখন দারুণ অশান্ত-বিক্ষুব্ধ; সেনা বাহিনীর সঙ্গে সাবেক গেরিলা গ্রুপ শান্তিবাহিনীর রক্তক্ষয়ী বন্দুক যুদ্ধ লেগেই আছে।

পাহাড়ি বিদ্রোহী গ্রুপ শান্তিবাহিনী দমনের নামে নিরাপত্তা বাহিনী লংগদু, লোগাং, নানিয়ারচর, বরকল, দীঘিনালা, পানছড়িসহ নানান এলাকায় একের পর এক গণহত্যা করেই চলেছে।

আর এই সব গণহত্যায় সরাসরি অংশ নিচ্ছে সমতল থেকে সেনা সহায়তায় পাহাড়ে পুনর্বাসিত বাঙালিরা; পাহাড়ের চলতি ভাষায় এদের বলা হয়– সেটেলার।

তো সেই সময় পেশাগত কারণে একাধিকবার ভারতের ত্রিপুরার একাধিক পাহাড়ি শরণার্থী আশ্রয় শিবিরে যাওয়া হয়। সাবরুম আশ্রয় শিবিরে পরিচয় হয় বর্ষীয়ান শরণার্থী নেতা প্রভাকুমার চাকমার সঙ্গে। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখান, বস্তির চেয়েও ঘিঞ্জি আর নোংরা শিবিরটিকে।

আশ্রয় শিবিরে তখন প্রায় ৭০ হাজার শরণার্থী মানুষ মরছে ঝাঁকে ঝাঁকে; কিলবিলে পোকার মতো অপুষ্টি, কলেরা, ম্যালেরিয়া, আর নানান অসুখে তারা মরছে ধুঁকে ধুঁকে।...

যাদের এক সময় ছবির চেয়েও সুন্দর ঘর-দুয়ার, জুমের ক্ষেত আর শাল কি সেগুন বাগান ছিলো, তারাই তখন গণহত্যার কবল থেকে জীবনটুকু বাঁচাতে পরিবার-পরিজন নিয়ে সীমানা পাড়ি দিয়ে আশ্রয় শিবিরে কাটাচ্ছেন শরণার্থীর গ্লানিময় জীবন। রিলিফের চাল-ডালের জন্য ভিখিরির মতো লাইনে দাঁড়াচ্ছেন শিশু সন্তানের মুখে দুটি অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য!

সাবরুম আশ্রয় শিবির ঘুরে দেখার সময় একঝাঁক চাকমা শিশু ঘিরে ধরে এই প্রতিবেদককে। এই সব শিশুর জন্ম আশ্রয় শিবিরেই। তারা শুধু বড়দের

কাছে শুনেছে, ওপারে বাংলাদেশে এক সময় তাদের আনন্দময় জীবনের স্বপ্নকথা। আর শুনেছে, দেশত্যাগের একটি অন্যতম কারণ গণহত্যা, সেটেলারদের জমিজমা দখলের নোংরা রাজনীতির টুকরো কথা।

শিশুর দল ঘিরে ধরে বাংলাদেশ থেকে আসা 'বাঙাল'কে। কিচিরমিচির করে চিৎকার করতে থাকে: সেটেলার! সেটেলার! সেটেলার!

প্রভাকর বাবু নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন তাদের। বলেন, আপনি কিছু মনে করবেন না যেন আবার। ওরা আপনাকে চিনতে পারেনি।

কিছুই মনে করার ছিলো না কখনোই। কিন্তু কচিকণ্ঠের সেই সব চিৎকার এখনো কেনো যেনো মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। মাথার মধ্যে আটকে যাওয়া ভাঙা রেকর্ডের মতো ঘুরতে থাকে সমবেত শিশু-স্লোগান: সেটেলার! সেটেলার! সেটেলার!...

* ফুটনোট: ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সুবাদে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রত্যাব্যসন ঘটে প্রায় ৭০ হাজার পাহাড়ি শরণার্থীর। তবে সেটেলাররা জায়গা-জমি দখল করে রাখায় এখনো অনেক প্রত্যাগত শরণার্থী তাদের জমি ফেরত পাননি।

উপরন্তু চুক্তির পর পাহাড়ে নতুন নতুন সেটেলার বসতি গড়ে উঠছে, বাড়ছে ভূমির বিরোধ, '১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি' ও শান্তিচুক্তিতে কথিত 'উপজাতীয় ও অধ্যুষিত অঞ্চলটির' জনসংখ্যার ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত; পাহাড়ে সাম্প্রদায়িক সন্দেহ-অবিশ্বাস বাড়ছে সমান মাত্রায়।

আর শরণার্থী শিবিরের সেইসব হতভাগ্য শিশু, যারা এখন বেড়ে উঠছে নতুন এই বৈরী পরিবেশে, তাদের এখনকার গূঢ় মনস্তত্ত্ব তো সহজেই অনুমেয়।

আদিবাসী সম্পর্কে ভুলে ভরা বাংলাপিডিয়া

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'উপজাতি' হিসাবে। তাদের খাদ্যাভ্যাস, জীবন প্রণালী, ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য– সব কিছু ব্যাখ্যা করা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

এই প্রতিবেদকের অনুসন্ধানে আদিবাসী সম্পর্কে অসংখ্য বিকৃতি এবং ভুল তথ্যের সমাবেশ ধরা পড়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ার বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণে। আদিবাসী নেতারা বলছেন, এই জ্ঞানকোষ পড়লে যে কেউ আদিবাসী সম্পর্কে বিকৃত ও ভুল ধারণা পাবে।

জ্ঞানকোষটির প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এসব ভুলের কথা অকপটে স্বীকার করে বলেছেন, পরবর্তী সংস্করণেই আদিবাসী সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য প্রত্যাহার করে তা নতুন করে প্রকাশ করা হবে। এ কাজের দায়িত্বও দেওয়া হবে আদিবাসী গবেষকদেরই।

বাংলাপিডিয়ায় দেওয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যের বেশিরভাগই বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন।

আদিবাসীরা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হলেও বাংলাপিডিয়ায় তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'উপজাতি' হিসেবে। সেখানে এমন অনেক তথ্য আছে যা ১০০ বছরের পুরনো, বর্তমান সময়ের আদিবাসী জীবনাচারের সঙ্গে যার কোনোই মিল নেই।

এতে মারমা ও রাখাইনদের 'মগ', টিপরা বা ত্রিপুরাদের 'তিপরা', ম্রোদের 'মুরং'- ইত্যাদি বিকৃত অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, ত্রিপুরাসহ অনেক আদিবাসী নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়ে এখন বাংলায় কথা বলে। যা আদৌ সঠিক নয়।

এতে 'উপজাতি' সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 'বাংলাদেশের বেশকিছু উপজাতি এখন নিজস্ব ভাষা বিস্মৃত হয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলে। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের তিপরাদের অনেকের ভাষা বাংলা।... অনেক উপজাতি আছে বহুভাষী। গারো ও খাসিয়ারা দ্বিভাষী। বাংলা ও নিজেদের ভাষায় যুগপৎ কথা বলতে পারে।.... দু'একটি ছাড়া সব উপজাতীয় ভাষাই অলিখিত, অর্থাৎ

সে সবের কোনো লিখিত রূপ নেই। চাকমা ও মগ (?) ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষার নিজস্ব বর্ণমালাও নেই।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯)

'খ্রিস্টান মিশনারিরা গারো ভাষায় রোমান অক্ষর প্রচলন করেন। পরে তারা চীনা চিত্রলিপির ন্যায় এক ধরনের লিপিমালাও আবিষ্কার ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনটাই স্থায়ী হয়নি। বাংলা হরফে গারো ভাষা স্বচ্ছন্দে লেখা যায়। বর্তমানে গারোদের পারিবারিক ভাষা গারো, কিন্তু পোষাকী ভাষা বাংলা।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০)

'উপজাতীয়রা তাদের টোটেম ছাড়া সবই খায়। বিড়াল গারোদের টোটেম। তাই তারা বিড়াল খায় না। মগ, চাকমা ও খাসিয়ারা গোমাংস ও গারোরা গোদুগ্ধ খায় না। মগ ও চাকমা নরনারী ধূমপানে অভ্যস্ত। টক ও পঁচা চিংড়ির প্রস্তুত খাদ্য তাদের প্রিয়। ওঁরাওরা ইঁদুর, বাইনমাছ, আলু, খেসারীর ডাল ইত্যাদি খায়। ভাত পচানো মদ সব উপজাতিরই প্রিয় পানীয়।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫)

'মগরা বাড়ি করে সমতলে।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬)

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বাংলাপিডিয়া বলছে, 'পাহাড়ি ভূমি চাষাবাদের অনুপযুক্ত। তবে প্রাকৃতিক উদ্ভিদাদি প্রচুর জন্মে। পাহাড়ি ঢালে জুম চাষের প্রয়াস চলছে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার সমতল ভূমিতে তুলা, ধান, চা ও তৈলবীজের চাষ হচ্ছে।' (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭১)

'কাপ্তাই হ্রদের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এ হ্রদের জন্য তাদের মূল ভূখণ্ডের ৪০ ভাগ ভূমি হারাতে হয়। ফলে প্রায় এক লাখ লোক গৃহহারা হয়ে পড়ে। এদের অনেকে ভারতের অরুণাচলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে বলে শোনা যায়।.... ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রায় দুই দশকের সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান হয়।' (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৬)

বাংলাপিডিয়ার ইন্টারনেট সংস্করণে বলা হচ্ছে, 'গারোদের প্রধান আয়ের উৎস হলো পাহাড়ের ঢালে জুম চাষ, পশু পালন ও শিকার। হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্প এখন তাদের আয়ের আরেকটি উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'স্বামী নপুংসক হলে খাসিয়া মেয়েরা একাধিক স্বামী রাখতে পারে।'

'চাকমা বর্ণমালার সাথে ত্রিপুরা বর্ণমালার মিল রয়েছে; তবে দুই ভাষার উচ্চারণ ভিন্ন।'

'মুরংদের অধিকাংশই খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। অধুনা ক্রামা ধর্মের প্রচলন হয়েছে।'

আদিবাসী নেতা ও গবেষকরা বাংলাপিডিয়ার বিভিন্ন অধ্যায় পাঠ করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

তারা বলছেন, বাংলাপিডিয়া পাঠ করলে যে কারো ধারণা হতে পারে, এ দেশের আদিবাসীরা আদিম, জংলী ও নরমাংসভোজী, বাংলাদেশে বাস করলেও তারা সবাই বহিরাগত।

আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও লেখক সঞ্জীব দ্রং এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আদিবাসী সম্পর্কে বাংলাপিডিয়ার কোনো তথ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে নানান বিকৃত তথ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ আদিবাসীকে অপমান করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়নি তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে। এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে–আদিবাসীরা অসভ্য, জংলী ও নরমাংসভোজী!'

পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য ও জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতা রূপায়ন দেওয়ান বলেন, 'বাংলাপিডিয়ায় 'আদিবাসী'র পরিবর্তে 'উপজাতি' শব্দটি ব্যবহার করে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রতি অবজ্ঞা ও উদাসীনতা দেখানো হয়েছে।"

তিনি বলেন, 'এতে অনেক ভুল, দুর্বল ও অপমানজনক তথ্য দেওয়া হয়েছে। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসও যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। বংশপরম্পরায় যুদ্ধবিধ্বস্ত পাহাড়ের রক্তাক্ত স্মৃতি বহনকারী আদিবাসী মানুষের কথা উল্লেখ নেই। প্রায় ৭০ হাজার পাহাড়ি শরণার্থীর গ্লানিময় জীবনের কথাও নেই গ্রন্থটিতে। কাপ্তাই লেকের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক পরিবর্তন ও জনজীবনের দুর্ভোগের কথাও নেই সেখানে।'

সাবেক গেরিলা নেতা রূপায়ন দেওয়ান বলেন, 'শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের নয় বছর পরও এর বাস্তবায়ন না হওয়ায় পার্বত্যাঞ্চলের জনজীবন যে আরো সংকুচিত হয়ে পড়েছে, বাংলাপিডিয়া পাঠ করলে তার কিছুই জানা যাবে না।'

গারো আদিবাসী নেতা ও লেখক বাঁধন আরেং বলেন, 'গারোদের সম্পর্কে ওই গ্রন্থে ব্যাপক তথ্য বিকৃতি রয়েছে। গারোদের খাদ্যাভ্যাস, বর্ণমালা, জীবনাচার সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তার অধিকাংশই ভুল।'

তিনি বলেন, 'বন উজাড় হওয়ার কারণে প্রায় ২০ বছর আগেই গারোরা জুম চাষ বন্ধ করেছে। বন না থাকায় শিকারও এখন হয় না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব গারোই পেশা পরিবর্তন করেছে। এছাড়া শুধু গারো বা

খাসিয়ারা নন, এ দেশের সব আদিবাসীই দ্বিভাষী, তাদের পোশাকি ভাষা হচ্ছে বাংলা।'

খাসিয়া আদিবাসী নেতা অনিল ইয়াং ইউম বলেন, 'খাসি নারীর বহুপতি সম্পর্কিত তথ্য একেবারেই ভুল। বন ও বনভূমি সংকুচিত হওয়ায় আদিবাসী জীবনে সৃষ্ট দুর্ভোগের কোনো কথাই ওই গ্রন্থে বলা হয়নি।'

ত্রিপুরা নেতা বিনতাময় ধামাই বলেন, 'ত্রিপুরা ভাষা মোটেই বিলুপ্ত হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মজীবনের প্রয়োজনে আমরা কেবল বাংলা ব্যবহার করছি।'

তিনি বলেন, 'ত্রিপুরাদের ব্যবহারিক বর্ণমালার সঙ্গে চাকমা বর্ণমালার কোনো মিলই নেই। নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় বহু বছর ধরে আমরা রোমান বা ইংরেজি হরফে নিজস্ব ভাষা চর্চা করছি।'

ম্রো আদিবাসী নেতা রাংলাই ম্রো বলেন, "বাংলাপিডিয়ায় আমাদের 'মুরং' বলে হেয় করা হয়েছে। ম্রোদের 'ক্রামা' নামে নিজস্ব ধর্ম ও বর্ণমালা আছে। আমরা ম্রো বর্ণমালার কম্পিউটার সফটওয়ারও তৈরির চেষ্টা করছি।"

তিনি বলেন, 'ম্রো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে যেসব তথ্য বাংলাপিডিয়ায় আছে- সেগুলো হয় বিভ্রান্তিকর, নয়ত ১০০ বছরের পুরনো জনজীবনের কথা।'

আদিবাসী সম্পর্কে বাংলাপিডিয়ায় এসব তথ্যবিভ্রান্তির কথা অকপটে স্বীকার করেছেন এর প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

তিনি বলেন, 'আদিবাসী নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা এরই মধ্যে এই বিষয়টি আমাদের জানিয়েছেন।'

নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা তথ্য বিকৃতির একটি কারণ স্বীকার করে তিনি বলেন, 'আমরা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি, তারা মনে করি অন্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা মানেই অনগ্রসর, আদিম ও অসভ্য। এ কারণে বাংলাপিডিয়ার মতো একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থে এসব মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে।'

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'একটি জাতিসত্তা যতোই ছোট হোক না কেন, তাদের ভাষা, বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ঐতিহ্য–সবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। বাংলাপিডিয়ার নানা খণ্ডে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেনি।'

তিনি জানান, জ্ঞানকোষের দ্বিতীয় সংস্করণে আদিবাসী সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য বাদ দিয়ে তা নতুন করে সংযোজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবার আদিবাসী লেখক ও গবেষকদের দেওয়া হবে এই কাজ। আর তা সম্পাদনা করবেন নৃতত্ত্বের একজন গবেষক। বিভ্রান্তি ও তথ্য বিকৃতি এড়াতে তথ্যগুলা প্রকাশের আগে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নেতাদের মতামতও নেওয়া হবে।

পল্লবের কাছে খোলা চিঠি

বন্ধু মাহবুব আলম পল্লবের ভ্রমণ কাহিনী পাঠ প্রতিক্রিয়া

প্রিয় পল্লব, সেদিন দৈনিক সমকালের একটা সাপ্লিমেন্টে আপনার লেখা দেখে আমি পত্রিকাটা টেনে নেই। এক টানে পড়ে ফেলি পুরো লেখা।

সমকালের বিভিন্ন পাতায় এর আগেও আপনার ভ্রমণ কাহিনী পড়েছি। আপনার সাবলীল ভাষা, প্রকৃতি দেখার সহজাত চোখ ও পর্যটকের মন আমাকে টানে। কিন্তু চিতমরমের পাহাড়ে মারমাদের বর্ষবরণ উৎসব 'সাংগ্রাই' নিয়ে আপনার এবারের লেখাটি ('চিতমরমের পাহাড়ে ম্যামাচিং-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল', শৈলী, এপ্রিল ২০০৬) আমি কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারলাম না–লেখাটির দিকদর্শনের কারণেই।

এর বিষয়বস্তু নয়, ভাষা নয়, এমন কি মূল রচনা সম্পর্কেও নয়, পাহাড়িদের দেখার যে লোভাতুর দৃষ্টি গত প্রায় ১০০ বছরে আমরা সংখ্যাগুরু বাঙালি জাতি তৈরি করেছি, সেই দৃষ্টিসুখের মোহ থেকে শেষ পর্যন্ত বন্ধুবরেষু পল্লবও বের হতে পারলেন না– আমার আপত্তি এখানেই।

প্রিয় পল্লব, আদিবাসী পাহাড়িদের নিয়ে আমরা সমতলের বাঙালিরা সব সময়ই একটা রোমান্টিকতায় ভুগী; বিশেষ করে পাহাড়ি মেয়েদের নিয়ে। এর একটা কারণ বোধহয়, পাহাড়ি মেয়েরা প্রকৃতির মতো সরল ও সুন্দর (আপনার ভাষায়– পরীর মতো)। যে কারণে পাহাড়ি মেয়েদের নষ্ট করার সুযোগও অনেক বেশি।

আপনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন– পাহাড়, অরণ্য, ঝর্নাধারায় নয়নাভিরাম পার্বত্যাঞ্চলের ইতিহাস, গণহত্যা, গণধর্ষণ, শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস। কল্পনা চাকমাকে মনে পড়ে নিশ্চয়ই। নিখোঁজ নারী নেত্রীর শেষ পরিণতি কি– আশা করি পল্লব, আপনি তা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতল কি পাহাড়ে– আদিবাসী অধ্যুষিত অন্যান্য এলাকার চিত্রও কী প্রায় একই রকম নয়? জমি কেড়ে নিয়ে, ভাষা কেড়ে নিয়ে, ধর্ম নষ্ট করে, মেয়েদের নষ্ট করে, গলা টিপে ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে ধ্বংস করার একটা নীরব সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র কী সর্বত্রই চলছে না?

একটু খেয়াল করে ষাটের দশক থেকে এ পর্যন্ত চলে আসা বাংলা-হিন্দি সিনেমা, এমন কি টিভি নাটক খেয়াল করে দেখবেন, সেখানে কী ভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে আদিবাসীদের– বিশেষ করে আদিবাসী মেয়েদের।

প্রচ্ছন্নভাবে ধারণা দেওয়া হচ্ছে, আদিবাসীরা জংলি, অসভ্য, এখনও ওরা নরমাংসভোজী।

আর সেইসব সিনেমা কি নাটকে দেখা যায়, শহর থেকে বাবুসাব গেছেন অরণ্যে বেড়াতে কি কর্মসূত্রে। ছমক ছমক নৃত্যগীতি-ঢোল-বর্শা-মদ্যপানে প্রেম হলো তার জংলি রাণীর সঙ্গে। ক্ষেপে গেলো 'পরদেশী বাবুর' ওপর পুরো অরণ্যচারী জনপদ– ইত্যাদি ইত্যাদি।

পল্লব, প্রিয় পল্লব, বছর সাতেক আগে কুলাউড়ার খাসিয়া পাহাড় গর্জে উঠেছিলো ইকো-ট্যুরিজম, তথা ইকো-পার্কের বিরুদ্ধে। আর এই সেদিন মধুপুরে আরেক ইকো-পার্ক রুখতে গিয়ে প্রাণ দিলেন একজন গারো আদিবাসী তরুণ।

তো সেই সময় বর্ষীয়ান খাসি নেতা অনিল ইয়াং ইউম আমাকে বলেছিলেন, যে পর্যটন আমার গ্রাম ধ্বংস করবে, নষ্ট করবে গাছবাঁশ, পানের বরজ, পাহাড়ি ছড়া, আর আমার মেয়েদের– আমি নেতা হিসেবে নই, এই পাহাড়ের মানুষ হিসেবে আমি যে কোনো মূল্যে সেই পর্যটন রুখে দেবো। আমি শহর চাই না, দালান চাই না, রাস্তা চাই না, বিদ্যুৎ, টিভি-সিনেমা চাই না। আমার অরণ্যে আমি যুগ যুগ ধরে আমার মতো করেই স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই।

জানি না বিষয়টি আপনাকে কতোটা বোঝাতে পারলাম। আমার বোঝানোর ক্ষমতাও তো সীমাবদ্ধ, তাই না?

তাই বলছিলাম, আপনার লেখা পড়ে সমতলবাসী+সুশিক্ষিত+প্রথম শ্রেণীর নাগরিক+সভ্য মানুষের মনে হতেই পারে, পাহাড় তাহলে প্রেমকাতর পরীতে ভরপুর! তারা নেচে নেচে সাংগ্রাই বারি বর্ষণ করবে; তখন বলা যাবে, সাংগ্রাই পানি ইজ সো ফানি।... ম্যামাচিং এর মতো সুন্দরীরা বলামাত্র মোবাইলে ফোন করবে, খুনসুটি করে পাল্টা প্রশ্ন করবে, কে রে?

পল্লব, পাহাড়ে কর্মরত নিরাপত্তা বাহিনীর একাধিক তরুণ সদস্যের সঙ্গে আমি কথা বলে জেনেছি, ম্যালেরিয়া, জঙ্গল-জলা, আর একাধিক সশস্ত্র

গোষ্ঠির ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পোস্টিং দেওয়ার জন্য তাদের ভাল বেতন আর ‘সেক্সি চাকমা মেয়ে’ অবাধে ভোগ করার লোভ দেখানো হয়।

সব মিলিয়ে তাই আপনার এবারের লেখাটা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারলাম না। এ জন্য বিশেষভাবে দুঃখিত।

শেষ করছি। ভাল থাকবেন। ভালবাসায় থাকবেন।

দি লাস্ট আইভরি ম্যান

গজদন্ত শিল্পী বিজয়কেতন চাকমা এই শেষ বয়সেও ঘুমঘোরে ফিরে যান দূর অতীতে। উঁচু পাহাড় থেকে বন-জঙ্গল ভেঙে নামছে ম্যামথের মতো প্রমাণ আকৃতির বুনো হাতির পাল। তাদের তাণ্ডবে তটস্থ পুরো পাহাড়। উজাড় হয় জুমের সাজানো বাগান। অথচ আদিবাসী মানুষ একে মেনে নেয় পাহাড়ি জীবনের স্বাভাবিকতা হিসেবে।

প্রজনন মৌসুমে হাতির পাল ভারী করার সুযোগ দেন তারা। বাকি সময় অরণ্যের গহীন পথে শিকারের খোঁজে ছোটেন দুর্ধর্ষ ম্রো কী বম আদিবাসী তরুণ। তার গাদা বন্দুকের নিশানায় কখনো বা ধরাশায়ী হয় দু-একটা। তারপর পাহাড় জুড়ে শুধুই উৎসব-আনন্দ।

এভাবেই বয়ে চলে পাহাড়ি জীবন। পরম মমতায় প্রতিটি প্রাণ সত্তাকে টিকিয়ে রেখে আদিবাসী মানুষ আবার সেগুলোকে আশ্রয় করেই বাঁচিয়ে রাখেন নিজেদের।

বিজয়কেতন চাকমা স্বপ্ন দেখেন, শিকারি নামমাত্র দামে হাত দেড়েক লম্বা হাতির দাঁত বিক্রি করলেন ব্রিটিশ সাহেব কী ফরেস্টের বড় কর্তার কাছে। সেখান থেকে আদেশ পেয়ে লংগদুতে মাচাং ঘরের ইজরে বসে কাজে ডুব দেন দাদু কল্পতরু চাকমা। ক্ষুদে হাতুড়ি-বাটাল দিয়ে হাতির দাঁতের ওপর আশ্চর্য-সুন্দর নকশা বোনেন তিনি।

কিন্তু এ সবই এখন ধূসর অতীত, স্বপ্নমাত্র। সংঘাত বিক্ষুব্ধ আদিবাসী বনের এখন ভিন্ন চিত্র। দিন গেলে বাড়ছে চির চেনা গাছ উজাড়ের সংখ্যা। বিপন্ন বনে এখন বিপন্ন বুনো হাতিও। তাই এখন দুর্দিনে বড়ই দুর্লভ বিশালাকায় সেই হাতির দাঁত। আর বিপন্ন প্রাণী হাতি শিকারও নিষিদ্ধ। সব মিলিয়ে বিজয়কেতনের তিন পুরুষের এই পেশা আজ তাই খাদের কিনারে। আর এ দেশে তিনিই সম্ভবত শেষ গজদন্ত শিল্পী।

বন উজাড়ের সঙ্গে হাতির অস্তিত্ব হারিয়ে যাক– তা চান না বিজয়কেতন। কিন্তু এরপরেও আছে চোরাই হাতি শিকারির উৎপাত। প্রবীণ এই গজদন্ত শিল্পী চান, বন থাকলে থাকবে বুনো হাতির প্রাচুর্য; আর নিজেদের পরিবেশে মাথা উঁচু করে বাঁচবেন অরণ্যচারী আদিবাসীরা।

বিপন্ন হাতি শিকারের পক্ষে নন তিনি। তবে তার আশা, আবার পুরনো দিনের নিঝুম অরণ্য ফিরে পেলে বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে তিনি বৈধ পন্থায় মৃত হাতির দাঁত সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু আদৌ কী মিটবে তাঁর সেই আশা?

রাঙামাটি সদরের জেল রোডের 'কল্পতরু' নামের বাসায় বিজয়কেতন চাকমা বলছিলেন এইসব কথা।

তিনি বললেন, বাবা মোহনবাঁশি চাকমার কাছে আমি কাজ শিখি সেই ১৯৬২ সালে, ছাত্র অবস্থায়। তারপর কখনো বন্ধ করিনি কাজ। আর এখন– একদম মেলে না হাতির দাঁত। তারপরেও খবর দেওয়া আছে বন বিভাগকে। কোনো হাতি মারা গেলে তাদের কাছ থেকে নিলামে দাঁত কিনে নেই। অনেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া হাতির দাঁতও মাঝে-মধ্যে বিক্রি করেন।

তিনি বলেন, হাতির আবাস আর খাদ্যের এখন বড় সংকট দেখা দিয়েছে। তার ওপর আছে, পাহাড় কেটে অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন। সব মিলিয়ে বুদ্ধিমান এই প্রাণীটি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় পাড়ি জমাচ্ছে ভারত ও মায়ানমারের গহীন অরণ্যে।

হাতির দাঁত দিয়ে মেয়েদের প্রায় সব ধরনের সৌখিন অলংকার বানান বিজয়কেতন। তার সংগ্রহে আছে কয়েক ধরনের চুলের কাঁটা, চিরুনি, আংটি, গলার হার, কানের দুল। ছেলেদের জন্য আছে টাইপিন, কোটপিন, কাফলিঙ্ক, টোবাকো পাইপ, সিগারেট হোল্ডার– ইত্যাদি।

এছাড়া আছে ছোটবড় নানান ধরনের শো-পিস। পাওয়া যাবে হাত পাখা, বুদ্ধ মূর্তি, হাতির প্রতিকৃতি, পেপার নাইফ, ছোটো-বড় স্টিক, ফুল-লতা-পাতার নকশা।...

কেমন দাম? এই প্রশ্নে বিজয় বাবু হেসে বলেন, এই সবের তো কোনো নির্দিষ্ট দাম নেই; পুরোটাই শখের বিষয়। কোন জিনিসের কতো দাম হবে, তা নির্ভর করবে কাজটির আকৃতি ও নকশার ওপর। দুশো টাকা থেকে শুরু করে এক লাখ টাকার জিনিসও পাবেন আমার কাছে।

এক লাখ টাকা!

ঠিক তাই, এর চেয়েও বেশি দাম হতে পারে। একটা আস্ত দাঁত খোদাই করে যদি সূক্ষ্ম নকশা করি, তবে দাম হতে পারে এক লাখ টাকারও বেশি। এ কাজে লাগবে এক থেকে দেড় মাস।

আমি জানতে চাই, আপনিই তো এই শিল্পের শেষ কারিগর। এরপর?

হতাশা ছড়ায় ৭০ ছুঁই ছুঁই শিল্পী বিজয়কেতনের কণ্ঠে, এর পর কি হবে জানি না। হাতির দাঁত না পেলে এই শিল্প টিকবে না।

বম আদিবাসীর ইতিহাস লেখা হচ্ছে

দেশের একটি ছোট্ট নৃ গোষ্ঠি 'বম' এই প্রথম নিজস্ব জাতির ইতিহাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছে। চাকমা, মারমা, রাখাইন, ত্রিপুরা, মণিপুরি, সাঁওতাল, গারো ও খাসিয়া জনগোষ্ঠির ইতিহাস প্রকাশের পর এ দেশে বসবাসকারী ৪৫ টি ভাষাগত সংখ্যালঘু আদিবাসীর এটি নবম জাতিগত ইতিহাস প্রকাশের উদ্যোগ।

'বম স্যোশাল কাউন্সিলের' সাবেক সভাপতি জুমলিয়ান আমলাই বম জাতিগোষ্ঠির ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করেছেন। তিনি এই প্রতিবেদককে জানান, এ জন্য তিনি মিজোরাম থেকে নানা বই-পত্র সংগ্রহ করেছেন। মিজোরামে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বমরা বাস করেন বলে সেখানে তাদের ওপর কিছু লিখিত দলিল ও বইপত্র রয়েছে। এছাড়া সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. লরেন্স জি. লোফলার ১৯৬৬ সালে বম ভাষার অভিধান প্রকাশের একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে সময় তিনি তার এই কাজটি শেষ করতে না পারলেও ড. লোফলার বমদের ওপর নিজস্ব কিছু গবেষণার কাজও করেন। এই সবই যুক্ত হচ্ছে বম জাতির ওপর লেখা এই প্রথম ইতিহাস গ্রন্থে।

জুমলিয়ান আমলাই বলেন, '১৯২৭ সালে বান্দরবানে বসবাসকারী সকল বম জনগোষ্ঠি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। বমদের নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় সে সময় ধর্ম প্রচারের জন্য পাদ্রীরা রোমান হরফে বম ভাষায় বাইবেলসহ নানা ধর্মীয় গ্রন্থ লেখেন। ষাটের দশক থেকে রোমান হরফে বম ভাষায় নানা উপকথা, গীতি কবিতা, লোক সংগীত– ইত্যাদি লেখা হচ্ছে। কিন্তু এ সবের চর্চা এখন একেবারেই কম। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে ব্যক্তি উদ্যোগে আমি এই ইতিহাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছি।'

ইতিহাসটি ইংরেজিতে লেখা হলেও পরে এটি একই সঙ্গে বম ভাষায় ও বাংলায় প্রকাশ করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে তিনি জানান।

পাহাড়ি নেতা জুমলিয়ান বলেন, 'খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর বমদের অনেক নিজস্ব সংস্কৃতি, রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। বিলুপ্ত হয়েছে আদিধর্ম প্রকৃতি

পূজা, গো-হত্যা উৎসব, বিভিন্ন অলৌকিকে বিশ্বাসসহ নানা রকমের প্রাচীন ঐতিহ্য। বয়োজ্যেষ্ঠদের স্মৃতিকথা থেকে সে সবও যুক্ত করা হবে এই ইতিহাস বইয়ে। ছোট ছোট পুরনো প্রবাদ-প্রবচনেও তুলে ধরা হবে আদি বম জীবন।'

তিনি আরও জানান, বম জাতির এই ইতিহাসটি প্রকাশের আগে বর্ষীয়ান পাহাড়ি বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের মতামতও নেওয়া হবে। এছাড়া তারা নতুন করে ড. লোফলারের বম ভাষার অভিধান প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

আদিবাসীদের জাতীয় সংগঠন আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বম জাতির এই ইতিহাস লেখার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'বম একটি প্রান্তিক ভাষাগত সংখ্যালঘু, অজানা ও উপেক্ষিত জাতিগোষ্ঠি। এই ইতিহাস শুধু আদিবাসীর ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করবে না, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করবে।'

তিনি বলেন, 'বম সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ছাড়াও এই ইতিহাসে পাহাড়ি আদিবাসী মানুষের বঞ্চনার কথাও যুক্ত করা প্রয়োজন। এই ইতিহাস গ্রন্থ যে শুধু গবেষকদেরই কাজে লাগবে, তা নয়, এটি হবে নতুন প্রজন্মের আদিবাসীদের জন্য শেকড়ের সন্ধান!'

আদিবাসী লেখক দীপায়ন খীসা জানান, বাংলাদেশে বসবাসকারী ৪৫টি আদিবাসীর প্রায় ২৫ লাখ জনগোষ্ঠি রয়েছে। এদের মধ্যে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামেই বাস করে ১৩টি আদিবাসী জনগোষ্ঠি। আশির দশকে রাঙামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট প্রকাশ করে 'চাকমা জাতির ইতিহাস'। তবে চাকমা ও মারমা জাতির একাধিক ইতিহাস অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে লিখেছেন।

বম স্যোশাল কাউন্সিলের ২০০৩ সালের জরিপ অনুযায়ী, বান্দরবানে ১,৯০০ পরিবারের ৯,৪৬১ জন বম জনগোষ্ঠির বসবাস। আর রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এই তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে বিন্যস্ত ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকার পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালি মিলিয়ে আনুমানিক প্রায় ১৫ লাখ লোক বাস করে।

বাঙাল বিপ্লব লঙ্ঘিল গিরি...

আমার বন্ধু বুদ্ধজ্যোতি চাকমার নিমন্ত্রণে বছরখানেক আগে ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো শীতে সাত দিন ছুটি নিয়ে আমি চলে যাই দূর পাহাড়ের ডাকে। বান্দরবান সদরের অস্থায়ী আবাস হয় বুদ্ধর বাড়িতেই। আমরা স্থির করি, কেওক্রাডং পর্বত চূড়া পরিদর্শনের। কারণ এটিই হবে এবার পাহাড় ভ্রমণের সবচেয়ে দুর্গম যাত্রা। আর তাছাড়া সেখানে গেলে একই সঙ্গে ইঁদুর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জুম চাষিদের বর্তমান অবস্থার ওপর সরেজমিন ফলোআপ নিউজও সংগ্রহ করা যাবে। পত্রিকায় জেনেছি, সেবার কয়েক দশক পর পাহাড়ের প্রান্তিক চাষী জুমিয়াদের লাখ লাখ একর জুমের ফসল বন্যার পানির মতো ধেয়ে আসা ঝাঁক ঝাঁক ধেড়ে ইঁদুর খেয়ে নষ্ট করেছে। চাকমা ভাষায়, এটি ইঁদুর বন্যা। আর বম ভাষায়, মাওথাম।

খুব ভোরে ডিসেম্বরের ঘন কুয়াশা আর হিম উপেক্ষা করে আমি আর বুদ্ধ ব্যাগ গুছিয়ে বের হই। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ব্যাগ ভারী হলে পাহাড় ভাঙতে খুব কষ্ট। তাই দুজনের ব্যাগে একপ্রস্থ শার্ট-প্যান্ট আর টুকিটাকি ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। বুদ্ধর একরত্তি ছেলে দেবংশি আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না ধরে। আমরা তাকে ভুলিয়ে, শিশুকণ্ঠের আর্তচিৎকার পেছনে ফেলে বান্দরবান বাসস্ট্যান্ড থেকে রুমা যাওয়ার লক্কড়-ঝক্কর ভাড়ার জিপ (স্থানীয় নাম– চাঁদের গাড়ি) ধরি। চাঁদের গাড়ির ছাদে শহর থেকে বেড়াতে আসা একদল ট্যুরিস্টকে দেখা যায়। বুদ্ধর ভাষায়, ওরা হচ্ছে 'ঠোঙা পার্টি'! দুষ্টুমি করে ও অবশ্য খুব একটা ভুল বলেনি। কি বিচিত্র সব সাজ পোশাক একেকজনের। এই শীতেও একেকজন হাফ হাতা গেঞ্জির ওপর হাফহাতা জ্যাকেট, হাফপ্যান্ট, উঁচু হাইকিং বুট আর বিশাল বিশাল হ্যাভারশেক নিয়ে চলেছে কেওক্রাডং। গলায় ঝুলছে দামি বাইনোকুলার কী ক্যামেরা। দু-একজন তো আবার টুপির ওপর কি মাথায় বাঁধা রঙিন রুমালের ওপর তুলে দিয়েছে সানগ্লাস।

বুদ্ধর রাগ যায় না। গজগজ করে ও, হুম। জিম করবেট একেক জন! শহর থেকে সাহেব এসেছেন জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে!

ও ভুলে যায়, আরেক ঠোঙা ওর পাশেই বসে আছে; সেও বেড়াতে এসেছে ওরই আমন্ত্রণে!

তো ঠোঙা পার্টি রুমা ঘাটে সেনা ছাউনিতে হাজিরা দেয়। আমরা চাঁদের গাড়ি থেকে নড়ি না (এই নিয়ে পরে সেনা ক্যাম্পগুলোতে নানান ধকল পোহাতে হয়)।

লম্বা একটি ট্রলারের ভেতর আর ছাদে গাদাগাদি করে বসি। শীতে শুকিয়ে আসা শঙ্খ নদী বেয়ে ট্রলার চলে। সেখানে মারমা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি জানান, মারমা ভাষায়, 'রুম্মা ছড়া' নামক নদী থেকেই 'রুমা' থানার নাম। আর মারমা কথা 'কেওক্রাতং' থেকে ইংরেজিতে 'কেওক্রাডং'। 'কেওক্রাতং' শব্দের অর্থ হচ্ছে শিলাপাহাড়।

নদীর দু'পাশে পালং শাকের মতো ছোট ছোট জুমচাষ দেখে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করে জানতে পাই, এগুলো হচ্ছে, তামাক পাতা। ব্রিটিশ-আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানি বান্দরবানে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে তামাক চাষের জন্য।

জুম চাষিরা দেখলেন, ধান চাষের চেয়ে তামাক পাতা চাষ অনেক লাভজনক। আর এগুলোর ক্রেতাও ওই কোম্পানি। এতে অনেক জুমিয়া পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছন্দ এসেছে ঠিকই। কিন্তু পরিবেশের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মারাত্মক।

তামাক পাতা পাহাড়ি ঝরনা বা নদীতে ধোয়ার ফলে মাইলের পর মাইল পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। মারা যাচ্ছে মাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ, কচ্ছপ, শামুক-ঝিনুকসহ নানা জীব-বৈচিত্র্য। এমন কি তামাক চাষিদের অনেকের যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ছে। অনেকের হাত-পায়ের নখ খসে যাচ্ছে!

রুমা বাজারে ট্রলার ভিড়লে সেখানে আমাদের স্বাগত জানায় চেওহ্লা চিং মারমা। সে প্রথম আলোর রুমা থানা প্রতিনিধি। ও আমাদের একজন বম গাইড ঠিক করে দেয়। চারজনে একটি রেস্তোরাঁয় মুরগি দিয়ে দুপুরের খাবার সেরে নেই। বেলা দুটার দিকে চাঁদের গাড়িতে করে রওনা দেই বগা লেক। কিন্তু যাত্রা পথে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই গাইডের সন্ধান পাওয়া যায় না। আর ঠোঙা পার্টিকে গরিব পাহাড়ি থানা শহরে কেনাকাটায় ব্যস্ত দেখা যায়। তারাও বগা লেক যাত্রা থেকে বাদ পড়ে।

চাঁদের গাড়ির ড্রাইভারের নাম শুক্কুর। সে বান্দরবানের স্থায়ী বাসিন্দা। যাত্রা পথে টুকরো আলাপে তার ক্ষোভ ঝরে পড়ে পাহাড়িদের ওপর। অনর্গল চট্টগ্রামের আঞ্চলিক উচ্চারণে মারমা আর বমদের গালাগালি করতে থাকে সে। তাদের ব্যবহার খারাপ, ঠিকমতো ভাড়া দিতে চায় না, একটু এদিক সেদিক হলে ড্রাইভার আর হেল্পারদের ধরে মারপিট করে– এই সব।

আমি মনে মনে বলি, ভাগ্যিস, এখানে চাকমাদের বাস নেই। নইলে শুক্কুর ড্রাইভার হয়তো বুদ্ধর চৌদ্দপুরুষের গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়তো!

মাটির কাঁচা আর উঁচু-নিচু এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়ি পথে আলাপ খুব বেশি দূর এগোয় না। ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি পথের একপাশের খাদে কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় আরেকটি চাঁদের গাড়িকে। শুক্কুর ড্রাইভার জানায়, বিস্ময়করভাবে ওই গাড়ির সব যাত্রী অক্ষত রয়েছেন। শুধু একজনের হাত ভেঙেছে। আর গাড়িটিও অক্ষত আছে। রুমা-বগা লেকের কাঁচা রাস্তাটি বর্ষাকালে হয়ে ওঠে ভয়ংকর। তখন গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে। কাদা, জোঁক আর সাপের উৎপাতে পায়ে হেঁটে চলাও বিপদজনক।

বিকাল নাগাদ আমরা পৌঁছাই বগা লেকে। সেখানে সেনা ছাউনি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। উঁচু টিলার ওপর ছাউনির সৈনিকদের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে আমাদের অবস্থা জেরবার।

কেন আমরা রুমা ঘাট আর রুমা বাজারের সেনা ছাউনিতে রিপোর্ট করে আসিনি, এখানে আমাদের 'কিছু হলে' তার দায়-দায়িত্ব কে নেবে, আমাদের সঙ্গে গাইড নেই কেন, আমি মুসলমান হয়ে কেন ঈদের দিনে বাড়িতে না কাটিয়ে এখানে এসেছি (পরদিনই কোরবানি ঈদ), বুদ্ধর সঙ্গে কি ভাবে আমার পরিচয়– ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর আগে পাহাড়ে কি সমতলে একাধিকবার সেনা, বিডিআর, র‍্যাব, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি, সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা মোকাবিলা করতে হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে আমি বরাবরই আমার নকশালাইট বাবা আজিজ মেহেরের সূত্র অনুসরণ করি: কখনো নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তর্ক করতে হয় না। যে কোনো বিষয়ে ওদের সঙ্গে ভদ্রভাবে সায় দিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ওই সূত্রায়নে নিস্তার পাওয়া যায় অবশেষে। বার বার হলফ করতে হয়, কিছুতেই আমরা কেওক্রাডং-এর পর গহীন পাহাড়ে যাব না।...

সেখানেই চোখে পড়ে একাধিক সেনা ও আনসার সদস্যর অ্যান্টেনা নিয়ে মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্ক পাওয়ার নিরন্তর কসরত। গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্ক দুর্বল; সিটি সেলের নেটওয়ার্ক আসে আর যায়।

এক সেনা সদস্যকে দেখা গেলো বাঁশের একটি খুঁটির সঙ্গে মোবাইল সেট বেঁধে লাউড স্পিকারে চিৎকার করে গ্রামের বাড়ির খোঁজ খবর নিতে, মা

কেমন আছেন? গরু কেনা হইছে? আমি ভাল আছি। কোনো চিন্তা করবেন না।

তার পেছনে কথা বলার জন্য অন্য সেনা সদস্যদের লাইন।

নব্বুইয়ের দশকের শুরুতে সারা দেশে মোবাইল ফোন চালু হলেও নিরাপত্তার অজুহাতে দেড় দশকেও রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এই তিন পার্বত্য জেলায় এখনো মোবাইল ফোন চালু হয়নি। অথচ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এক দশক আগে।

অন্যদিকে 'ইনসার্জেন্ট এরিয়া' খ্যাত ভারতের সেভেন সিস্টারস রাজ্যগুলোতে মোবাইল ফোন চালু হয়েছে অনেক আগেই।

কবে যে আমাদের কর্তাদের বোধোদয় হবে!

তো চট্টগ্রাম জোনের নেটওয়ার্ক পার্বত্যাঞ্চলের কোনো কোনো উঁচু পাহাড়ে পাওয়া যায়। সেটুকুই ভরসা বিচ্ছিন্নভাবে পাহাড়ের সঙ্গে চলছে সমতলের মোবাইলে কথোপকথন।

বগা লেক ঘিরে ছোট্ট একটি বম পাড়া। গ্রামটি এরই মধ্যে ছোট-খাটো পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে দুটি সরকারি, আর একটি বেসরকারি বাঁশের তৈরি মাচাং ঘরের 'রেস্ট হাউজ'। কুয়াশায় পুরো লেকটি ভাল করে চোখে পড়ে না। তবু চারিদিক সবুজ পাহাড় ঘেরা বিশাল ও শান্ত প্রাকৃতিক হ্রদটির অনাবিল সৌন্দর্য টের পাই। স্থির জলের ওপর ভাসছে নীল শাপলা ফুল আর নানান ধরনের নাম না জানা লতা-পাতা। অনেক দূরে জলের ওপরে উড়তে দেখা যায়, একঝাঁক বক। পাহাড় ঘেরা হ্রদটিকে দেখে হঠাৎ করে ভ্রম হয় ন্যাশনাল জিওগ্রাফি টেলিভিশনের কোনো টুকরো দৃশ্য বলে।

ঝুপ করে রাত নামে শিলা পাহাড়ের দেশে।

আমরা একটি বম দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে নেই। দোকানি এক কিশোরী ময় বম। তাদেরই পারিবারিক টিন শেডের মাচাং ঘরের রেস্ট হাউজে থাকার ব্যবস্থা হয়। মাথাপিছু সিট ভাড়া মাত্র ষাট টাকা। ময় মহাজনের দোকানেই তিন বেলা ভাতের ব্যবস্থা আছে। আমি 'ময়' শব্দের অর্থ জানতে চাই। চটপটে কিশোরী এবার লাজুক হয়। তার চতুর জবাব, যখন কেওক্রাডং পাহাড়ের চূড়ায় উঠবেন, তখনই জানবেন, এই কথার অর্থ! পরে জেনেছি, বম ভাষায় 'ময়' কথার অর্থ হচ্ছে, সুন্দরী।

পাশের একটি মারমা গ্রাম থেকে এক বোতল 'প্রাইং' সংগ্রহ করে দুজনে রেস্ট হাউজে গল্পে মাতি। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে ভাতের রস থেকে তৈরি প্রাইং মদের জুড়ি নেই। এটি চাকমাদের 'দো-চোয়ানি'র চেয়েও কড়া। অনেকেরই ধারণা, প্রাইং-এর ৭৫ থেকে ৮০ ভাগই হচ্ছে অ্যালকোহল। এর রঙ একেবারে পানির মতো স্বচ্ছ; বোতল ঝাঁকালে পুরো মদটিতে দেখা যায় ফেনার বুদবুদ। আর বোতল খুলে নাকের কাছে ধরলে সহজেই টের পাওয়া যায় এর ঝাঁজ।

আধ বোতল প্রাইং শেষ করে আমরা ময় মহাজনের রান্না করা ডিমের ঝোল তরকারি আর দুতিন রকম জুমের সব্জি দিয়ে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি।

মাঝরাতে শীতের চোটে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বেড়ার রেস্ট হাউজের ফাঁক গলে হু হু করে আসছে হিমেল হাওয়া। চারদিকে সুনসান নীরবতার ভেতর শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর প্যাঁচার ভৌতিক কনসার্ট। দুটি পাতলা কম্বল আর একটি বম তাঁতের কম্বলেও শীত মানে না। শেষে চামড়ার জ্যাকেটটির ওপর ওই তিন কম্বল জোড়া দিয়ে শীত কাবু করে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন সকাল সাতটার দিকে ফ্রেস হয়ে ময় মহাজনের দোকানে ভাত আর চা খেয়ে আমরা রওনা দেই কেওক্রাডং-এর উদ্দেশে। আমাদের গাইড হন সাংলিয়ান কার্বারী (গ্রাম প্রধান)। বয়স তার বছর পঞ্চাশ। হ্যাভারশেক না থাকায় উঁচু পাহাড় ভাঙতে খুব একটা কষ্ট হয় না। তবে টের পাই, ২০ বছর ধরে নিয়মিত ধূমপানের ফলে ফুসফুসে দম কমে গেছে। মাঝে মাঝে হাঁপরের মতো বুক ওঠানামা করে। বাঙাল বিপ্লবের কাহিল দশা দেখে দুই পাহাড়ি দাঁত বের করে হাসেন। মাঝে মাঝে অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠে যাওয়া।

পথে পথে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য মুগ্ধ করে আমাদের। পাহাড়ি পথের পাশেই মাইলের পর মাইল লাল রঙের নাম না জানা বুনো ফুল ফুটে আছে। বুনো আমলকির গাছে কিচির মিচির করছে রং-বেরং-এর পাখি, কাঠবেড়ালি। মাঝে মাঝে দূর পাহাড়ে চোখে পড়ে জুম চাষের জমি। আর সেখানে জুমের ফসল পাহারা দেয়ার জন্য ছোট্ট অস্থায়ী মাচাং ঘর।

পথের এক পাশে একটি কালো রঙের গাছের গুঁড়ি দেখে জানতে পারি, এটি প্রায় দুশো বছরের পুরনো চম্পা গাছের গুঁড়ি। পাহাড়ে যতো ধরনের গাছ-গাছালি জন্মে এর মধ্যে চম্পা ফুলের গাছই সবচেয়ে দামি। আর কাঠচোররা কিছুদিন আগে এই গাছটি প্রকাশ্যেই কেটে নিয়ে গেছে! প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে এর প্রতিবাদ করারও সাহস করেনি কেউ!

আমি সাংলিয়ান কার্বারীর কাছে জানতে চাই বগা লেকের ইতিহাস। পোড় খাওয়া মানুষটি ভাঙা বাংলায় আমাকে যা বলেন, সংক্ষেপে তা অনেকটা এ রকম:

বম ভাষায় বগা লেক হচ্ছে 'বগা রেলি'। 'বগা' মানে অজগর, আর 'রেলি' হচ্ছে লেক। লেকের উত্তরে বাস ছিল এক ম্রো পাড়ার। সেটি ব্রিটিশ আমলেরও আগের কথা। একবার ম্রো'রা বিশাল এক অজগর সাপ জ্যান্ত ধরে আনেন। পাড়ার সবচেয়ে বুড়ো লোকটি অনুরোধ জানান সাপটিকে যেন আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ এটি হচ্ছে পাহাড় দেবতা। বুড়োর কথায় কেউ কান দেয়নি।

সবাই মিলে রাতের বেলা সাপটি আগুনে পুড়িয়ে মদ দিয়ে খায়। কিন্তু বুড়ো লোকটি সাপের মাংস ছুঁয়েও দেখেন না।

ওই রাতে পাহাড়ি ঢল নেমে পুরো ম্রো পাড়াটি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পানির স্রোতে মারা পড়েন সবাই। বেঁচে যান একমাত্র সেই বুড়ো। সেই থেকে লেকটির সৃষ্টি।

এখনো নাকি ওই ম্রো বুড়োর ভিটেয় অজগরটির গুহা আছে।...

আমি জানতে চাই, আচ্ছা কার্বারী দা, আপনাদের এখানে শান্তিবাহিনী ছিলো? আপনি কখনো দেখেছেন তাদের?

উনি বলেন, শান্তি বাহিনী কখনো আমাদের এখানে স্থায়ীভাবে ছিলো না। শুধু একবার আমি জুম চাষ করতে গিয়ে ১০-১৫ জনের একটি দলকে পাহাড়ি পথ অতিক্রম করতে দেখেছি। সবার পরনে পাতা রঙের সবুজ পোশাক। আর ভারী ভারী হাতিয়ার। তবে আমাদের এখানে অনেক বছর ছিল মিজো বাহিনী (মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, এমএনএফ)। কেওক্রাডং-এর এই পথটি ধরেই মিজো নেতা লাল ডেঙা চলাচল করতেন।

এবার আমি ও বুদ্ধ দুজনেরই কৌতূহল, কেমন দেখতে উনি?

কার্বারী দা বলে চলেন, লাল ডেঙা খুব লম্বা-চওড়া বলশালী মানুষ। বয়স প্রায় ৬০ বছর। পরনে সাদা শার্ট আর নীল প্যান্ট। সব সময় ওনার নিরাপত্তায় থাকতো ৫০-৬০ জনের একটি বাহিনী। ওদের পরনেও ছিল পাতা-সবুজ পোশাক। অস্ত্র-শস্ত্র সবার হাতে হাতে। মিজো দলে অনেক মহিলা যোদ্ধাও ছিলো। কিন্তু মিজো বাহিনী খুব খারাপ।

কেন?

তার উত্তর, ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত মিজো বাহিনী আমাদের এখানে ছিলো। তারা দিনের পর দিন আমাদের গ্রামে আস্তানা গেড়ে বাস করতো। আমরা তাদের খাওয়াতাম, আবার চাঁদার টাকাও দিতাম। তাদের ছাগল, মুরগি, শুকর কেটে ভাত দিতে হতো। আমাদের কোনো মেয়েকে তাদের পছন্দ হলে জোর করে ওরা বিয়ে করতো। আমাদের দিয়ে ওরা এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে বিনে পয়সায় বোঝা টানাতো।

একবার আমাদের গ্রামের একজন বম মেয়েকে মিজো বাহিনী বিয়ে করে ওপারে মিজোরামে নিয়ে যেতে চায়। আমি বাধা দিলে ওরা আমাদের তিনজনকে গুলি করে মারার জন্য এক সারিতে দাঁড় করিয়েছিল। পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে আমরা দৌড়ে পালিয়ে সেবার বাঁচি।

সাংলিয়ান কার্বারী বার বার আক্ষেপ করে বলেন, আমি শুনেছি, মিজোরাম দেশটি নাকি খুব সুন্দর। মিজো বাহিনী জয়লাভের পর ওখানে নাকি এখন খুব শান্তি। জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা, জুম করা যায়, ঘন বনে শিকারও মেলে প্রচুর। কিন্তু আমি কখনো মিজোরামে যাব না। মিজো বাহিনী খুব খারাপ।

আমরা জানতে চাই, পাকিস্তান কী বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সঙ্গে মিজো বাহিনীর কখনো বন্দুক যুদ্ধ হয়নি?

কার্বারী দা বলেন, আরে না। পাকিস্তান আর্মি আর বাংলাদেশ আর্মিই তো মিজো বাহিনীকে এপাড়ে আশ্রয় দিয়েছে। ওরা মিলেমিশে থাকতো। কেউ কাউকে ঘাঁটাতো না। মাঝে মাঝে এ-ওর ক্যাম্পে বসে চা-বিস্কুটও খেতো!

পথে পথে আমরা কথা বলি বম, মারমা আর ত্রিপুরা জুমিয়াদের সঙ্গে। ইঁদুর বন্যায় সবাই সর্বশান্ত হয়েছেন। এখন অন্যের জুমে দিন মজুরিই ভরসা। অনেকে দিন মজুরির কাজ খুঁজতে দূর-দূরান্ত থেকে রুমা বাজারে রওনা হয়েছেন। আদা কিংবা শীতের সব্জি চাষ করে ক্ষতি পুষিয়ে নেবেন, এমন সংগতিও অধিকাংশের নেই। ফসলের বীজও খেয়ে ফেলেছে ইঁদুর। ঘরে ঘরে হাহাকার। সামনের বর্ষায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার আতঙ্ক সবার চোখে-মুখে। প্রশাসন থেকে কেউ কোনো খবর নেয়নি এইসব অসহায় মানুষের।

ঘণ্টা তিনেক পাহাড় ভাঙার পর আমরা ছবির মতো সুন্দর একটি বম গ্রামে পৌঁছাই। নাম দার্জিলিং পাড়া। সেখানে যুবক-যুবতী প্রায় কেউই গ্রামে নেই। ইঁদুর বন্যার পর সবাই দলে দলে এদিক-সেদিক কাজ খুঁজতে গেছেন। আমাদের স্বাগত জানায় ছোট্ট বম দোকানি সাহিত। সে রুমা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বড়দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে (বমদের অধিকাংশই ছয় দশক আগে প্রোটেস্টাইন খ্রিস্টান হয়েছেন।)।

সাহিত বমের দোকানে চা-বিস্কুট-কলা খেয়ে আমরা আবার রওনা দেই কেওক্রাডং এর পথে। আধঘণ্টা হাঁটার পরে ভর দুপুরে পৌঁছাই দেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বত শিখরে। সেখানে বম ছাত্র-ছাত্রীরা বড়দিন উপলক্ষে পথচারীদের জন্য বিনে পয়সায় বাঁশের চোঙায় করে রং চা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি চলছে গিটার বাজিয়ে বম ভাষায় গানের রিহার্সেল।

আমরা চা খেয়ে কেওক্রাডং এর চূড়ায় ফটো সেশন করি। বগা লেক থেকে ১০ কিলোমিটার খাড়া পাহাড় ভেঙে মনে হয়, আরে! এই পাহাড় বিজয় তো মোটেই এতো দুর্গম আর এতো কষ্টকর নয়!

* ফুটনোট : মাস ছয়েক আগে ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পাহাড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক চালু করেছে। এতে সেখানে সহজলভ্য হয়েছে তথ্য-যোগাযোগ। লক্ষণীয়, গণমাধ্যমে এ নিয়ে প্রায়ই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এতো বছর সেখানে মোবাইল ফোন চালু করা হয়নি কেন, এর নেপথ্যে হাঁটু-বুদ্ধি কাদের ছিলো, তা ভুলেও কোথাও বলা হয় না।